আল- কুরআন বুঝে পড়া উচিত

পরম করুণা ময় ও পরম দয়াময় মহান আল্লাহর দরবারে অভিশপ্ত শয়তান থেকে মুক্তি চাই। পরম করুণাময় আল্লাহর নামে শুরু করছি, যিনি দাতা ও অশেষ দয়ালু।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা আপনাদের সালামের মাধ্যমে অভিনন্দন জানাই, যা কিনা আমরা যাঁরা মুসলিম তাঁদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট রীতি। শান্তি, দোয় ও রহমত আপনাদের সাথী হোক। আজকের আলোচনার বিষয় বস্তু হলো : আল-কোরআন ব্যুৎপত্তি বা বোধগম্যতাসহ তিলাওয়াতের প্রয়োজনীয়তা।

এক কথায় বলা যায় যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক মহানবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রতি নাযিলকৃত সর্বশেষ গ্রন্থ বা বাণী সংকলনই হলো কোরআন। আরো বিস্তারিত বলা যায়, পবিত্র কোরআন হলো সর্বোত্তম পাণ্ডুলিপি যা পুরো মানবজাতির জন্য সর্বোৎকৃষ্ট ইশতেহার। একজন অবিশ্বাসীর জন্য নিশ্চিতভাবেই এটি একটি হুশিয়ারি বার্তা যেমনি বিপরীতক্রমে মুমিন বান্দার জন্য সুসংবাদের অধার। কোনো সন্দেহের অবকাশ না রেখেই যে কোনো ভুক্তভোগীর জন্য সর্বময় মাঝে সমস্যার সুস্পষ্ট সুলিখিত সমাধান। নিরাশ ব্যক্তিরা এর মাঝে আশার আলো খুজে পায়।

এটা কীভাবে সম্ভব অথবা কীভাবে আশা করা যায় যে, যথাযথ অন্তর্নিহিতভাব, অর্থ, নির্দেশনা ও মর্মভেদ না করেই কোরআনের সর্বময় রঙে নিজেদের রাঙাবেন? কোরআনী অনুশাসনের প্রয়োগ ও সার্বক্ষণিক চর্চাই কল্যাণ লাভের সর্বোৎকৃষ্ট পন্থা।

কোরআনের সংক্ষিপ্ত পরিচয়

'কোরআন' আরবি শব্দ যা এসেছে 'ক্বারা' ধাতু থেকে অর্থাৎ পড়া। তাই কোরআনে এর শাব্দিক একটি অর্থ বই যা পড়ার, অনুধাবনের, গবেষণার ও ব্যুৎপত্তি অর্জনের। কোরআনের অন্য একটি প্রতিশব্দ 'ফোরকান' যা কোরানের মধ্যে বিবৃত হয়েছে। ফোরকান এ জন্য বলা হয় যে, কোরআন ভালো-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ-অকল্যাণ, মঙ্গল-অমঙ্গল এবং সর্বোপরি গ্রহণীয়-বর্জনীয় জিনিসগুলো পৃথক করে, একটি থেকে অন্যটিকে আলাদা করে আমাদের সামনে পেশ করে।

কোরআন, মুসলিম জাতির এক শ্রেষ্ঠত্বের উৎস

আলহামদুলিল্লাহ, পবিত্র কোরআন মাজীদ হলো পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি তিলাওয়াতকৃত তথা পঠিত গ্রন্থ। কিন্তু এটি এর একটি দিক, এর বিপরীত দিকটি সম্ভবত ক্বারী তথা পাঠকদের জন্য সবচেয়ে অস্বস্তিকার। তা হলো বেশির ভাগ পাঠকই ব্যুৎপত্তি বা অর্থ-অনুধাবন ছাড়াই এটা তেলাওয়াত করে থাকেন যা পাঠক ও কোরআনের মধে একটি সেতুবন্ধন ও বোঝাপড়া সৃষ্টির বড় অন্তরায়। ফলে স্বাভাবিকভাবেই আমরা কোরআন থেকে প্রাপ্য

উপকারিতা থেকে বঞ্চিত হই। এর চেয়ে মর্মপীড়ার আর কী হতে পারে যে, তোমার কাছে কোরআন থেকে তুমি খালি হাতে ফিরে চলছো? কোরআন তিলাওয়াত হচ্ছে অথচ হৃদয় অবিচল ও জীবন অপরিবর্তনীয়! অথচ আল্লাহ তাআলা কোআনে সূরা আলে ইমরানের ১১০ নং আয়াতে সুস্পষ্টভাবে বলেছেন,

كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ .

অর্থ ঃ "তোমরা মুসলিম, অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষ থেকে।" এই যে 'খাইবা উম্মাহ্' তথা সর্বোত্তম জাতি মুসলিমগণ, এর কারণ ও কিন্তু কোরআনের এর পরের আয়াতেই বিবৃত করা হয়েছে। আর তা হলো আমরা কল্যাণ, ভালো ও সুন্দরকে আঁকড়ে ধরি। এক সাথে অকল্যাণ, অসুন্দর তথা মন্দকে বর্জন করি। তাহলে কোরআনের বিবৃতি অনুযায়ী মঙ্গল ও কল্যাণের সাহচর্য আর অমঙ্গল ও অকল্যাণের থেকে মুখ ফিরিয়ে নেওয়াই মুসলিমদের শ্রেষ্ঠত্বের আসনে বসায় প্রধান শর্ত ও কারণ। আর এই যে গ্রহণ-বর্জনের প্রশ্ন এটি পুরোপুরি ভালো ও মন্দ সম্পর্কে পূর্ণ ধারণা ও জ্ঞানের উপর নির্ভরশীল। যদি আমাদের জ্ঞানের বাইরেই থেকে যায় কোনটি ভালো, গ্রহণীয় আর কোনটি মন্দ ও অস্পৃশ্য। তবে কীভাবে গ্রহণ ও বর্জনের কর্ম আমরা সম্পাদন করতে পারি? কোরআন থেকেই এ ধারণাগুলো পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া।

কোরআন কেন বুঝে পড়া উচিত?

ন্যায় ও অন্যায়ের পার্থক্য, ভালো ও মন্দের ব্যবধান ও কল্যাণ ও অকল্যাণের দূরত্ব হৃদয়ঙ্গম করতে হলে কোরআন অর্থসহকারে বুঝে তেলাওয়াত করা জরুরি। আসুন বিষয়টি হিসেব করে দেখি, কি কারণে মুসলমানদের নিকট প্রদত্ত সর্বশ্রেষ্ঠ পুরস্কারটি কেন বোধগম্য তথা উপলব্ধি ছাড়াই পঠিত হয়?

প্রধান কারণ হলো, কোরআন এসেছে আরবি ভাষায়, যে ভাষা সম্পর্কে আমাদের অধিকাংশেরই ন্যূনতম ধারণা বা জ্ঞান নেই। বর্তমান পৃথিবীর ৬৫০ কোটি জনসংখ্যার ২০ ভাগ তথা ১০০ কোটিরও বেশি মুসলি। এর মধ্যে মাত্র ১৫ শতাংশ আরবি ভাষী। খুবই কম বেশি সংখ্যক মুসলমানই আরবি ভাষা সম্পর্কে জ্ঞান রাখেন। মোটকথা, মুসলিম বিশ্বের আশি ভাগেরও বেশি মানুষ আরবি ভাষা সম্পর্কে অজ্ঞ।

যখন কোনো শিশু জন্ম নেয় তখন সে ভাষাহীন থাকে অর্থাৎ সকল ভাষাই তার কাছে অজ্ঞাত থাকে। কালক্রমে পরিবার, পরিবেশ ও সমাজ থেকে পর্যায়ক্রমে ও তথ্য আদান-প্রদানের মাধ্যম হিসেবে মাতৃ ভাষা আয়ত্ব করতে থাকে। এরপরে সময়ের পরিক্রমার কেউ কেউ একাধিক এমন কি অনেকে চার, পাঁচ বা তারও অধিক ভাষা আয়ত্ব করে। একথা সর্বজনসম্মত যে, ভাষা আয়ত্ব করা নিশ্চিতভাবেই শৈশবে অনেক সহজসাধ্য। তবে বয়স বাড়লেই যে তা অসম্ভব হয়ে পড়ে ব্যাপারটি তেমন নয়, বিশেষত, তা যদি সৎ উদ্দেশ্য হয়ে থাকে।

এ ব্যাপারে একটি দৃষ্টান্ত দেয়ার লোভ আমি ধরে রাখতে পারছি না। উদাহরণটি সম্পৃক্ত তিনি ফ্রান্সের ড. মরিস বুকাইল সম্পর্কে। বুকাইলি একজন ফরাসি বিজ্ঞানী ও সার্জন। তিনি গভীরভাবে বিশ্বাস করতেন বাইবেলে উল্লিখিত ফারাও ও হযরত মূসা (আ)-এর কিস্‌সা। কিন্তু এ নিয়ে গবেষণা করতে গিয়ে তিনি অবাক বিস্ময়ে অবিভূত হয়ে লক্ষ্য করলেন যে তিনি যা এই মাত্র আবিষ্কার করলেন তা হাজার বছরেরও অনেক আগেই পবিত্র কোরআনে উল্লেখ রয়েছে। বিষয়টি তাকে এতোটাই নাড়া দেয় যে, এটি তাঁকে আরবি ভাষা শিখতে উদ্যোগী করে তোলে। তিনি খ্রিষ্টান হয়ে পঞ্চাশ বছর বয়সে আরবি ভাষা যথাযথভাবে আয়ত্ব করতে মনোবিবেশ করেন, যাতে

কোনো অনুবাদের সহযোগিতা ছাড়াই সরাসরি কোরআন অনুধাবন করতে পারেন। বিষয়টি তাঁকে এতোদূর পর্যন্ত নিয়ে যায় যে, তিনি শুধু আরবি ভাষা সম্পর্কিত জ্ঞান আহরণ করেই ক্ষান্ত হননি, পরবর্তীতে একটি গ্রন্থও লিখে ফেলেন। যার শিরোনাম 'বাইবেল, কোরআন ও বিজ্ঞান' (The Bible, The Quran and Science)। এতে সুস্পষ্টভাবেই তুলে ধরা হয়েছে বর্তমান বৈজ্ঞানক তত্ত্বের সাথে পবিত্র কোরআনের পরিত্র কোরআনের পরিপূর্ণ সাদৃশ্য, পক্ষান্তরে বর্তমান বাইবেলের সাংঘর্ষিক অবস্থান ব্যাস্থা করা হয়েছে।

কোরআন এসেছে সমস্ত মানবজাতির।

মুসলমানদের মধ্যে একটা ভুল ধারণা বেশ প্রচলিত। তা হলো পবিত্র কোরআন শুধুমাত্র মুসলমান জাতির জন্য এসেছে। তাই তারা ভেবেই বসে থাকেন কোনো মুসলিমেরই উচিৎ হবে না কোনো অমুসলিমকে পবিত্র কোরআন উপহার দেওয়া। অথচ পবিত্র কোরআনের সূরা ইবরাহীমের প্রথম আয়াতেই আল্লাহ বলেন,

الٓر ۚ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ.

অর্থ ঃ "এটি এমন একটি গ্রন্থ যা আমি আপনার প্রতি এ উদ্দেশ্যে নাযিল করেছি যেন মানুষ পায় আলোর দিশা, ঘোর অন্ধকার হতে।"

কোথাও এমন বলা হয়নি যে, শুধু হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই দায়িত্ব মানব সম্প্রদায়কে মুক্তির পথে নিয়ে আসা। সমগ্র মুসলিম জাতিরই দায়িত্ব ভ্রষ্ট ও অন্ধকারে নিমজ্জিত মানুষগুলোকে আলোকজ্জ্বল পথে নিয়ে আসা।

সূরা ইবরাহীম- এর ৫২ নং আয়াতে আল্লাহ বলেন,

هٰذَا بَلٰغٌ لِّلنَّاسِ وَلِيُنْذَرُوْا بِهٖ وَلِيَعْلَمُوْٓا اَنَّمَا هُوَ اِلٰهٌ وَّاحِدٌ وَّلِيَذَّكَّرَ اُولُوا الْاَلْبَابِ.

অর্থ ঃ "এটি মানুষের জন্য একটি সংবাদনামা এবং যাতে এর দ্বারা মানুষ ভীত হয় এবং জেনে নেয় যে, উপাস্য তিনিই একক এবং যাতে বুদ্ধিমানরা চিন্তা-ভাবনা করে।"

সূরা বাকারার আয়াত নং ১৮৫- এ বলা হয়েছে,

شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِيْٓ اُنْزِلَ فِيْهِ الْقُرْاٰنُ هُدًى لِّلنَّاسِ وَبَيِّنٰتٍ مِّنَ الْهُدٰى وَالْفُرْقَانِ.

অর্থ ঃ "রমজান মাস কোরআন নাযিলের মাস। কোরআন মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সৎ পথের যাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট নির্দেমনা। আর ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে বিভেদ নির্দেশকারী।"

সূরা যুমার-এর আয়াত- ৪১ এ বলা হয়েছে,

اِنَّآ اَنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتٰبَ لِلنَّاسِ بِالْحَقِّ فَمَنِ اهْتَدٰى فَلِنَفْسِهٖ وَمَنْ ضَلَّ فَاِنَّمَا يَضِلُّ عَلَيْهَا وَمَآ اَنْتَ عَلَيْهِمْ بِوَكِيْلٍ.

অর্থ ঃ "মানুষের কল্যাণের জন্য আমি আপনার প্রতি প্রেরণ করেছি সত্য ধর্মসহ কিতাব। আর যে কল্যাণের পথে আসে সত্য ধর্মসহ কল্যাণ নিশ্চিত করে। আর যে, ভ্রষ্ট হয় সে নিজের অনিষ্টই করে। আপনি তার জন্য দায়ী নন।"

এখানে শুধু আরব জাতিকেই নির্দেশ করা হয়নি বরং আপামর মানব সম্প্রদায়- এর অন্তর্ভুক্ত।

সূরা আল ক্বালাম ৫২ আয়াত এবঙ সূরা তাকভীর-এর ২৭ নং আয়াত নির্দেশ করে,

إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَٰلَمِينَ ـ

অর্থ ঃ "আর এটি (কোরআন) পুরো বিশ্ববাসীর জন্য উপদেশ।"

অর্থাৎ এটা শুধু আরবদের জন্য নয় বরং সমগ্র বিশ্ববাসীর তথা সমগ্র মানব জাতির জন্য।

সূরা আম্বিয়া-এর ১০৭ নং আয়াতে বলা হয়েছে, وَمَا أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَٰلَمِينَ ـ

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য কল্যাণ স্বরূপ পাঠিয়েছি।"

সূরা সাবা-এর ২৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَمَا أَرْسَلْنَٰكَ إِلَّا كَافَّةً لِّلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ـ

অর্থ ঃ "আমি আপনাকে কোন সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসেবে, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না।"

মহাজন্য আল-কোরআন বুঝে পড়ার উপায়

এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য বিষয় হচ্ছে ড. মরিস একজন নাসারা তথা খ্রিষ্টান হয়েও পবিত্র কোরআন সম্পর্কে এতোটাই আগ্রহী ছিলেন যে, তিনি পঞ্চাশ বছর বয়সে আরবি ভাষা শিখতে শ্রম ব্যয় করেছিলেন এবং সর্বোপরি সফলও হয়েছিলেন। কিন্তু তাই বলে আমি এতোটাও আশা করি না যে, সমস্ত মুসলিম উম্মাই আরবি ভাষা শিখতে সক্ষম হবে। তবে ইচ্ছা থাকলে,উদ্যমী হলে অনেকেই যে সফল হবে না তা আশা করতে বাধা কোথায়? বিশ্য এটা ভাবার কোনো অবকাশ নেই যে, যারা আরবি ভাষা বোঝেন না তারা পবিত্র কোরআন অনুধাবন ছাড়াই পাঠ করবেন। আল্লাহর অশেষ মেহেরবানীতে বর্তমানে পৃথিবীর প্রধান প্রধান ভাষাসহ প্রায় সকল ভাষাতেই তা অনূদিত ও ভাষান্তরিত হয়েছে। মাওলানা আবদুল মজিদ দরিয়াবাদীর কথা অনুযায়ী পবিত্র কোরআনের ভাষান্তর অন্য যে কোনো ভাষায় রচিত যে কোনো গ্রন্থ থেকে নিশ্চিতভাবেই বেশ আয়াসসাধ্য কাজ। যেহেতু পবিত্র কোরআনের ভাষা স্বর্গীয়, মহৎ, মৌলিক ও অলৌকিক, তাই এর অনুবাদ অসম্ভব মেধার দাবী রাখে। অন্য কোনো ভাষায় রূপান্তরের জন্য কোরআন সত্যিই অত্যন্ত কঠিন গ্রন্থ।

পবিত্র কোরআনের ভাষা এতোই উৎকৃষ্ট ও উঁচু দরের যে, কোনো একটি শব্দের অর্থ বুঝতে গেলে একাধিক শব্দ এমন কি পুরো বাক্যটিও দরকার হতে পারে। একই আরবি শব্দ একাধিক স্থানে একাধিক অর্থে ব্যবহৃত হয়। সে জন্য মূল আরবি ভাষায় সৌন্দর্য অন্য কোনো ভাষঅয় প্রকাশ সত্যি সত্যিই অসম্ভব। এতোসব বাধা বিপত্তি সত্ত্বেও পৃথিবীর বিভিন্ন পণ্ডিত ও মনীষী বিভিন্ন ভাষায় পবিত্র কোরআকে অনুবাদ করেছেন। তাই আপনি যে ভাষায় সবচেয়ে বেশি দক্ষ সেই ভাষায়ই কোরআনের অনুবাদটি পড়লেই সবচেয়ে বেশি কোরআনের কল্যাণ লাভে সমর্থ হবেন। ভাষাটি উর্দু, হিন্দি, তামিল, গুজরাটি, ফারসি, ফরাসি, বাংলা বা ইংরেজি যাই হোক না কেন। আমরা স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ে হাজার হাজার ঘন্টা শ্রম দিয়ে কত লাখ লাখ বই পড়ে কিছু অংশ মুখস্থ করি, যার অনেক অংশই কোনো কাজেও লাগে না। এর ফাঁকে একটু সময় বের করে পবিত্র কোরআন দৈনন্দিন বুঝে বুঝে অধ্যয়ন করলে কতটুকুই বা সময় যাবে?

মহানবী নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হলেন, যা তিরমিযী শরীফে উল্লিখিত হয়েছে, যে তিনদিন কোরআন শেষ করলো সে কিছুই জানলো না। আপনি যদি ধীরে সুস্থে বুঝে পড়েন হয়তো শেষ করতে একমাস লাগতে পারে। আর ভালোভাবে বুঝে প্রতিদিন এক পারা পরিমাণ তিলাওয়াত করেন, তবে ত্রিশ দিন তথা এক মাসেই শেষ হয়ে যাবে।

তার চেয়ে চরম হতভাগ্য কইতে যে কিনা পবিত্র কোরআনের সংস্পর্শে এলো অথচ তা থেকে কিঞ্চিং পরিমাণও কল্যাণ লাভ করতে পারলো না? আপনি অনেক অধ্যবসায় করে, অনেক শ্রম দিয়ে অনেক সার্টিফিকেট পেয়েছেন। কিন্তু কি নিশ্চয়তা আছে যে, সেটি কাজে লাগবেই? অনেক স্নাতক উত্তীর্ণকেই বেকার বা চাকরির খোঁজে হন্যে ঘুরতে দেখা যায়। আবার অনেক স্নাতকোত্তরও আছেন যাঁদের সারা জীবনের অধ্যয়ন পেশা জীবনে কোনো কাজে আসে না। তবে এটা পরিস্কার যে, সাধারণভাবে শিক্ষা অতীব গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। কিন্তু তাই বলে কোরআন শিক্ষাকে অন্য শিক্ষার থেকে কম গুরুত্ব পূর্ণ মনে করা কোনোভাবেই গ্রহণীয় নয়। যে কোরআনের চেয়ে মূল্যবান কিছুর আশায় ঘোরে, তার ঘোরা সবই মায়া, মরীচিকার পেছনে, অহেতুক সময় ও শ্রমের অপব্যয়।

পবিত্র কোরআনের সূরা বাকারাহ্‌র ১ ও ২নং আয়াতে মহান আল্লাহ বলেন,

الٓمٓ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۛ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۔

অর্থ: "আলিফ, লাম, মীম। এটা সেই গ্রন্থ যার মধ্যে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই। এটি মুত্তাকীদের জন্য পথ প্রদর্শক।

এছাড়া সূরা স্বোয়া'র সূরা যুমার ২৭-এ বলা হয়েছে,

وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِىْ هٰذَا الْقُرْاٰنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُوْنَ ۔

অর্থ: "আমি এ কোরআনে মানুষের জন্য সব দৃষ্টান্তই দিয়েছি যেন তারা করতে পারে।"

পবিত্র কোরআন মানুষকে সফলতা, কল্যাণ ও মঙ্গলের নিশানায় ধাবিত করে। ইহকাল ও পরকাল তথা পার্থিব ও অপার্থিব দুই জীবন ও জগতেই সফল করে তোলে।

মনে করুন, আপনার একজন জার্মান বন্ধু আছে। সে আপনার অত্যন্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু। সে আপনার দেশে এলো। অনেক কষ্টে ভাঙ্গা ইংরেজিতে দু জন ভাব-বিনিময় করলেন। যেহেতু আপনারা অন্তরঙ্গ বন্ধু, আশা করি বাক্যালাপ যত কষ্টেরই হোক দু'জনেই তা উপভোগ করবেন। কিন্তু বন্ধুটি যদি দেশে ফিরে গিয়ে জার্মান ভাষায় চিঠি পাঠায় আপনি কী তা বুঝবেন, উনি আপনার যত কাছের বন্ধুই হোন না কেন? অবশ্যই আপনাকে আগে চিঠিটি অনুবাদ করে নিতে হবে। অর্থাৎ আপনাকে যেতে হবে অনুবাদকের কাছে। কেন যাবেন? নিশ্চয় আপনার প্রিয় বন্ধু আপনাকে চিঠি কী লিখেছে তা জানার আগ্রহ আপনার মধ্যে কাজ করে। যদি তাই হয়, তবে পবিত্র কোরআনের মতো ইহকাল ও পরকালের বন্ধু আপনাকে কি বললো তা জানতে ও বুঝতে কী এতোটুকুও ইচ্ছে হয় না! আমরা মুসলিমরা সব সময়ই জানি এবং স্বীকার করি যে, এ পৃথিবীতে সকলের ইচ্ছার ওপরে আল্লাহর ইচ্ছা। কারো ইচ্ছাই সে যেন হোক না কেন, সব সময় বা সত্যি বলতে অধিকাংশ সময় পূরণ হয় না, কিন্তু আল্লাহর ইচ্ছা সর্ব অবস্থায় পূরণীয়। তাহলে আমাদের কেন ইচ্ছে হয় না তাঁর কথা জানার, বুঝার। অথচ আন্তরিকভাবে চেষ্টা

করলেই যে কোনো অনুবাদ সংগ্রহ করে যে কোনো সময় আমরা কোরআনের অর্থ অনুধাবন করে অনেকটাই অগ্রগামী হতে পারি।

কোন অমুসলিমকে কোরআন উপহার দেওয়ার নেই কোনো বাধা

অনেক মুসলিম মনে করেন পবিত্র কোরআন কোনো অমুসলিমকে দেওয়া যাবে না। তারা এক্ষেত্রে সূরা ওয়াকিয়াহ্-এর ৭৭-৮০ নং আয়াত হিসেবে দাড় করেন,

إِنَّهُ لَقُرْآنٌ كَرِيمٌ . فِي كِتَابٍ مَكْنُونٍ . لَا يَمَسُّهُ إِلَّا الْمُطَهَّرُونَ . تَنْزِيلٌ مِنْ رَبِّ الْعَالَمِينَ .

অর্থঃ "নিশ্চয়ই পবিত্র কোরআন সবচেয়ে সম্মানিত যা অত্যন্ত সুরক্ষিত এবং অপবিত্র অবস্থায় স্পর্শ নিষিদ্ধ। এটা জগতসমূহের প্রতি পালকের পক্ষ হতে অবতীর্ণ।"

এর যথার্থ হিসেবে তারা ধরেই নেন যে, পবিত্র কোরআন পবিত্রতা ছাড়া স্পর্শ করা যাবে না। আর যেহেতু অমুসলিমঘন অপবিত্র তাই তাদের স্পর্শে কোনোভাবেই কোরআনকে নেওয়া যাবে না।

আরবি শব্দ "কিতাবিম্মাকনুন" দ্বারা এ পৃথিবীতে আমাদের সামনে যে কোরআন রয়েছে তা নির্দেশিত হয়নি। আবার 'মুহাহ্হারিন" দ্বারা কেবল পরিচ্ছন্নতাই বুঝানো হয়নি। প্রকৃত ব্যাপার যদি তাই হতো, তবে যে কোনো অমুসলিম মার্কেটে ৮০ থেকে ১০০ টাকায় একটি কোরআন কিনে কোরআনকে মিথ্যা প্রমাণিত করা প্রয়াস পেত। কেননা অর্থ করা হয়ে থাকে যে, অপবিত্র ব্যক্তি এটা স্পর্শ করতে পারবে না। আসলে বর্ণিত আয়াতের মর্মার্থ হচ্ছে পবিত্র কোরআন লৌহ মাহফুজে সংরক্ষিত আছে। আর ঐ সংরক্ষিত কোরআনটি ফেরেশতা ব্যতীত অন্য কোনো অপবিত্র ও লৌকিক বস্তু কোনোভাবেই স্পর্শ করতে পারবে না।

অনেকেই আবার মত দেন যে, যদি অমুসলিমকে কোরআন প্রদানের একান্তই অভিপ্রায় থাকে তবে যেন আরবি বর্ণমালা ছাড়া কেবল অনুবাদকৃত কোরআন দেওয়া হয়।

অনূদিত কোরআন দেওয়াতে কোনো দ্বিমত বা সমস্যা নেই। তবে যদি কেউ সত্যিকার অর্থেই কোরআন দিতে চায় তবে আরবিসহ দিতে অসুবিধা কোথায়? যদি অনুবাদে কোনো ভুল থাকতেই আরবি অংশই তা শুধরে নেওয়ার একমাত্র অবলম্বন। তাই আমি ব্যক্তিগতভাবে পছন্দ করি অমুসলিমকে আরবিসহ অনুবাদকৃত কোরআন প্রদান করতে।

অমুসলিম ও কোরআন, মহানবী (স)-এর দৃষ্টান্ত

যদি শেষ বিচার দিনে আল্লাহ্ তায়ালা আমাকে প্রশ্ন করেন আরবিসহ কুরআন কেন আমি অমুসলিমদের দিয়েছি, তাতেও আমার ভয়ের কারণ নেই। কেননা আমি নিশ্চিতভাবেই জানি আমি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে আমার পক্ষে পাব। তিনি নিজেই বিভিন্ন সময় অমুসলিম বাদশাহদের কাছে আরবি ভাষায় লিখিত পত্র পাঠাতেন যার মধ্যে কোরআনের আয়াতও থাকতো। আবিসিনিয়ার আদশাহ্, সম্রাট হিরাক্লিয়াস, ইয়েমেনের রাজা, মিশরের বাদশার নিকটেই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহান পত্র দিয়েছেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ইসলাম গ্রহণ করলো, কেউ কেউ পাঠানো পত্র ছিড়ে ফেলল, অনেকেই পদতলে পিষ্ট করলো। তাই মহান আল্লাহ যদি সত্যিই আমাকে অভিযুক্ত করেন তবে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে অবশ্যই কাছে

পাব। এ ধরনের একটি পত্র এখনো ইস্তাম্বুলের একটি জাদুঘরে সংরক্ষিত রয়েছে। এ পত্রে সূরা আলে ইমরানের ৬৪ নং আয়াতে স্পষ্টভাবেই বলা আছে,

قُلْ يَاَهْلَ الْكِتٰبِ تَعَالَوْا اِلٰى كَلِمَةٍ سَوَآءٍۢ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اَلَّا نَعْبُدَ اِلَّا اللّٰهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهٖ شَيْئًا وَّلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا بَعْضًا اَرْبَابًا مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ ۚ فَاِنْ تَوَلَّوْا فَقُوْلُوا اشْهَدُوْا بِاَنَّا مُسْلِمُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "হে আহলি কিতাবগণ! একটি বিষয়ের দিকে আসো যা আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সমান, আর তা হলো আমরা কেউই আল্লাহ্ ব্যতীত আর কারো ইবাদত করবো না। তাঁর সাথে কাউকে সমকক্ষ মানবো না এবং আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে পালনকর্তা গ্রহণ করবো না। এরপরও যদি তারা মেনে না নেয় তবে ঘোষণা করে দিন 'সাক্ষী থাকো আমরা মুসলিম'।"

প্রিয় নবী হযরম মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম অমুসলিম রাজাদের নিকট যে পত্র পাঠাতেন তাতে কোরআনের আয়াতগুলো থাকতো।

যারা বলেন, অমুসলিমদের আরবী অংশ ব্যতীত শুধু পবিত্র কোরআনের অনুবাদ দেওয়া যায় তাদের প্রতি আমার জিজ্ঞাসা– আরব দেশসমূহে আরবি ভাষী যে ১৪ মিলিয়ন খ্রিষ্টান রয়েছে, বংশ পরম্পরায় খ্রিষ্টান খ্রিষ্টান থাকা এ মানুষগুলো কোন্ ভাষায় অনূদিত কোরআন বুঝবে?

কোরআন বুঝা সহজ

আবার অনেক মুসলিম মনে করেন কোরআন অর্থসহ বুঝে তিলাওয়াত করা শুধু আলিমদের জন্যই উন্মুক্ত থাকা দরকার। তারা মতামত দেন যে, সাধারণ মানুষ অর্থ বুঝে পড়তে গিয়ে বিভ্রান্ত বা পথ ভ্রষ্ট হয়ে যেতে পারে। আমি অনেকবার ভেবেছি পবিত্র কেরআনের চারটি আয়াত নিয়ে যা কিনা একটি সূরায় চারবার ব্যবহার করা হয়েছে। সূরা আল ক্বামার-এর আয়াত ১৭, ২২, ৩২ ও ৪০ এ বলেন,

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْاٰنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِنْ مُّدَّكِرٍ ـ

অর্থ ঃ "আমি কোরআনকে উন্মুক্ত করেছি ও তোমাদের বুঝার জন্য সহজ করেছি।"

সুতরাং ভাবনার কি আছে? আল্লাহ যেখানে নিজেই কোরআনকে বুঝার ও মনে রাখার জন্য সহজ বলে নিশ্চয়তা দান করেছেন, সেখানে এটা ভাবার অবকাশ থাকে না যে, আলিম ছাড়া অন্য কেউ বুঝার চেষ্টা করলে পথভ্রষ্ট বা গোমরাহ্ হয়ে যাবে তাহলে কাকে বিশ্বাস করবেন আল্লাহ্ কে নাকি যারা ভ্রষ্টতার অভিযোগ করে তাদেরকে?

পবিত্র কোরআনে বারবার বুঝে পড়ার তাগিদ দেওয়া হয়েছে। সূরা বাক্বারা-এর ২৪২ নং আয়াতে আল্লাহ্ তায়ালা বলেন,

كَذٰلِكَ يُبَيِّنُ اللّٰهُ لَكُمْ اٰيٰتِهٖ لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "এভাবে আল্লাহ তাঁর বিধান স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো।"

সূরা হিজর-এর ১নং আয়াতে আল্লাহ তায়ালা বলেন,

الٓرٰ ۔ تِلْكَ اٰيٰتُ الْكِتٰبِ وَقُرْاٰنٍ مُّبِيْنٍ ۔

অর্থ : "এগুলো পবিত্র কোরআনের সুস্পষ্ট নিদর্শন যা সম্পূর্ণভাবে বোধগম্য।"

তাহলে যারা, পথচ্যুতির সম্ভাবনা দেখে, তাদেরকেই বিশ্বাস করবো নাকি আল্লাহকে বিশ্বাস করবো?

একই সাথে পবিত্র কোরআনের সূরা নাহ্‌ল-এর ৪৩ নং আয়াতে উল্লেখ রয়েছে,

فَسْئَلُوْٓا اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

"অত : "অতএব জ্ঞানীদের জিজ্ঞাসা কর যদি তোমাদের জানা না থাকে।"

সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতের শেষাংশে বলা হয়েছে,

اَلرَّحْمٰنُ فَسْئَلْ بِهٖ خَبِيْرًا ۔

অর্থ : "তিনিই 'রাহমান' তার সম্পর্কে যারা সম্যক অবগত তাদেরকে প্রশ্ন করে জেনে নাও।"

এখানে বলা হচ্ছে, কোরআন সম্পর্কে কোনো প্রশ্ন যদি থাকে তবে তার কাছে জিজ্ঞাসা কর যে জানে বা যার কাছে তথ্য আছে।

কোরআন ও আধুনিক বিজ্ঞান; একটি দৃষ্টান্ত

চার বছর পূর্বে একটি বিশেষজ্ঞ দল স্থির সিদ্ধান্তে করলেন নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত যত তথ্য কোরআনে উল্লেখ তা তারা একত্রিত করবেন এবং পবিত্র কোরআনের পথ নির্দেশ পালন করবেন। সূরা নহলের ও সূরা ফুরকানের ৫৯ নং আয়াতে,

فَسْئَلْ اَهْلَ الذِّكْرِ اِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُوْنَ ۔

অর্থ : "অতএব জ্ঞানীদের প্রশ্ন কর যদি জিজ্ঞেস তোমাদের জ্ঞানের বাইরে থাকে। এটা সম্পর্কে যারা তাদের জিজ্ঞেস করে জেনে নাও।"

তাই তারা স্থির করলেন যে, নৃবিজ্ঞান সম্পর্কিত আয়াতগুলো তারা কানাডার টরেন্টো বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান ডিপার্টমেন্টের প্রধানের কাছে অনুবাদ করবেন। যখন তার নিকট সেগুলো দেওয়া হলো তখন তিনি দেখলেন সর্বাধুনিক আবিষ্কৃত বিষয়টিও পবিত্র কোরআনে দেড় হাজার বছর আগের বর্ণনার সাথে শতভাগ মিলে যায়। তিনি বললেন যে, তিনি কিছু অংশ বুঝতে পারছেন না। কেননা তার এ ব্যাপারে কোনো জ্ঞান সীমিত। এ অজানা বিষয়গুলোর মধ্যে একটি অংশ ছিল সূরা আলাকের ১ ও ২নং আয়াত,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ۔ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ۔

অর্থ : "পড় তোমার প্রভুর নামে যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন, যিনি মানুষকে জমাট বাধা রক্ত থেকে সৃষ্টি করেছেন।"

এ ব্যাপারে একজন ডাক্তার ড. বিট মোর বললেন, তিনি ঠিক জানেন না যে, শিশু মাতৃগর্ভে আসার প্রাক্কালে সত্যি সত্যিই জমাটবাধা রক্ত হিসেবে থাকে কিনা তিনি বিষয়টি গবেষণায় নেমে পড়লেন। তিনি ভ্রূণকে শক্তিশালী অনুবীক্ষণ যন্ত্র দিয়ে পর্যবেক্ষণ করে জমাট বাধা রক্তের বিভিন্ন পর্যায়ের সাথে তুলনা করে দেখতে লাগলেন। এতে

তার চোখ তো ছানাবড়া। একি! পবিত্র কোরআনের বর্ণনার অবিকল সঞ্চালনা ঘটলো তার যন্ত্রের সামনে। তাকে কেরাআনে বর্ণিত নৃবিজ্ঞান বিষয়ক ৮০ প্রশ্ন করা হলে, তিনি তার উত্তর দিতে গিয়ে বললেন, এ প্রশ্নগুলো যদি তাকে ৩০ বছর আগেও করা হতো তবে তিনি ৫০ ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারতেন না। কেননা নৃবিজ্ঞান বিষয়টি মাত্র ৩০ বছর আগে স্বতন্ত্র বিষয় হিসেবে অবির্ভাব ঘটেছে। অথচ বিষয়গুলো অনেক যুগ আগেই।

এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়টি একটি বই লিখলেন বইটিতে তিনি কোরআনে বর্ণিত বিষয়গুলো পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে যাচাই করে ঐ বিষয়গুলো সন্নিবেশিত করলেন, বইটি তাঁর লিখিত সর্বশ্রেষ্ঠ বইয়ের মর্যদা পেল। এমনকি এখনো যারা এম. বি. বি. এস. পড়াশোনা করে তাদেরকে বলা হয় যদি ভালোভাবে বুঝে ভালো নম্বর পেতে চাও তবে ড. কীট মোরের লিখিত বইটি অবশ্যই অনুসরণ করতে হবে। তাই দেখা যায়, পবিত্র কোরআনে বর্ণিত কোনো বিষয়ের ব্যাখ্যা ও তাৎপর্য ঐ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিই কেবল বর্ণনা করতে পারেন। ড. কীট মরিস এরপর স্বীকার করেন যে, তার মধ্যে একথা বলতে কোনো কার্পণ্য নেই যে, পবিত্র কোরআন নির্ভুল একটি মহাগ্রন্থ এবং মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সত্যি সত্যিই আল্লাহ প্রেরিত রাসূল।

আলিমের জ্ঞানীকের পরিচয়

'আলিম' অর্থ কী? 'আলিম' অর্থ জ্ঞানী, যার জ্ঞান আছে তিনি আলিম, আলিম অর্থ এটা নয় যে, কোনো বিশেষ শিক্ষা ব্যবস্থায় ১২-১৪ বছর যাবত অধ্যয়ন করেছে। আপনি যদি কোরআনের বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো আয়াত ব্যাখ্যা জানতে চান তবে কার কাছে যাবেন? নিশ্চয়ই কোনো নাপিত বা কোনো চামারের কাছে নয় নিশ্চিতভাবেই কোনো বিজ্ঞানীর কাছে যাবেন। কেননা বিজ্ঞানী হচ্ছে বিজ্ঞান এর আলিম, আবার যদি চিকিৎসা বিজ্ঞান বিষয়ক কোনো বিষয় জানার থাকে তবে আপনি কার কাছে যাবে? অবশ্যই কোনো চিকিৎসক-এর কাছে যাবেন তিনি এ বিষয়ের জ্ঞান রয়েছে। অনুরূপভাবে যদি পবিত্র কোরআনের 'নুযুল' বা অবতীর্ণ হওয়ার প্রেক্ষাপট সম্পর্কিত কোনো তথ্য জানতে চান তবে অবশ্যই আপনার যাওয়া উচিত কোনো আলিমের নিকট যিনি দারুল উলুম বা এমন প্রতিষ্ঠানে ১২-১৪ বছর অধ্যয়ন করেছেন, এভাবে আপনি যখন যে বিষয় সম্পর্কিত সমস্যার মুখোমুখি হবেন, আপনার উচিত সেই বিষয় সংশ্লিষ্ট ব্যক্তির কাছে যাওয়া।

মানবজাতির ম্যানুয়াল; আল-কোরআন

আমরা বাজার হতে যখন নতুন কোনো ইলেকটঙ্গি যন্ত্র ক্রয় করি তখন একটি ম্যানুয়াল দেওয়া হয়। কেন দেওয়া হয়? কারণ সমাধা ঐ যন্ত্রটি কীভাবে চালাতে হয়, কীভাবে কোনো সুইচ দিয়ে কোনো কাজ করা হয় তার বিস্তারিত বর্ণনা ঐ ম্যানুয়ালে থাকে। যদি, আপনি একটি টেপ রেকর্ডার কিনেন, আপনাকে ম্যানুয়েল দেওয়া হবে। তাতে বর্ণনা করা হবে কে.ন সুইচ দিয়ে ক্যাসেট ঢুকানো হবে, কোন সইচ দিয়ে চালাতে হবে, কোন সুইচ দিয়ে কিছু সময়ের জন্য থামাতে হয়, আবার কোন সুইচ টিপ দিলে বন্ধ হয়। এভাবে আপনি যদি পণ্যটি ভালোভাবে অপারেট করতে চান তবে সুইচ অবশ্যই ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা বইটি মেনে চলতে হবে।

এমনকি যন্ত্রের পরিচার্যার বিভিন্ন দিক-নির্দেশনা ম্যানুয়েলে দেয়া থাকে, যেমন উপর থেকে ফেলবেন না, যন্ত্রটি ভিজে গেলে কী ক্ষতি হবে, কত ডিগ্রি তাপমাত্রায় রাখা যাবে ইত্যাদি। অর্থাৎ ভালোভাবে যন্ত্রটি ব্যবহার করতে চাইলে অবশ্যই ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা পুস্তক প্রয়োজন। লক্ষ্যণীয়, ঐ ম্যানুয়েল কিন্তু অন্য কেউ সরবরাহ

করে না বরং নির্মাতা প্রতিষ্ঠান নিজেরাই দিয়ে থাকে। কেন নিজেরা দেয়? কেননা যেহেতু যন্ত্রটি তাদের উৎপাদন তারাই এর টেকনোলজি সম্পর্কে ভালো জানে, তারাই এর দিক-নির্দেশনা ও চালানোর রীতিনীতি বেশি ভালো করে দিতে পারবে। অর্থাৎ বিষয়টি কী দাঁড়ালো? নির্মাণ কাখাই কোন কিছুর পরিচালনা পদ্ধতি, ম্যানুয়াল বা দিক-নির্দেশনামূলক পুস্তক যা-ই বলি না কেন, সেটা দিতে পারবে।

আমি প্রসঙ্গটির এজন্যই অবতরণা করলাম যে, মানুষ একটি জটিল যন্ত্র, একটি সুপার কম্পিউটারের চেয়েও লক্ষ লক্ষ গুণ জটিল হচ্ছে মানুষের দেহ যন্ত্র। তাই এটিও সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য একটি সুন্দর এবং যথাযথ ম্যানুয়াল অবশ্যক। আর এ ম্যানুয়াল তথা জীবন পরিচালনা পদ্ধতি বা দিক-নির্দেশনাই হচ্ছে আল-কোরআন। লক্ষ্যণীয় যে, পণ্য প্রস্তুত বা নির্মাতা প্রতিষ্ঠানই ম্যানুয়াল বই দিয়ে থাকে। তেমনিভাবে যেহেতু মানুষের সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ তাই মানুষের চলার পদ্ধতি, জীবনচার, দিক-নির্দেশনা সম্বলিত সামগ্রিক তথ্য ও নির্দেশনা মানুষের চলার পদ্ধতি, জীবনাচার, দিক-নির্দেশনা সম্বলিত সামগ্রিক তথ্য ও নির্দেশনা মানুষের নির্মাতা, সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ-ই দেওয়ার ক্ষমতা, এখতিয়ার ও সামর্থ্য রাখেন, অন্য কেউ নয়। কোনো পণ্য যেমন নিজের ম্যানুয়াল তৈরি করতে পারে না বরং তার নির্মাতাই সেটা করার একমাত্র ক্ষমতাবান, তেমনি মানুষও নিজে নিজের চলার দিকনির্দেশনা তৈরি করার ক্ষমতা রাখে না বরং মানুষের নির্মাতা ও সৃষ্টিকর্তার জন্যই সেটি শোভণীয়, এরই ফল হলো আল-কোরআন। অনেক সময় এমনও দেখা যায়, বিশেষ করে যে পূণ্যটি একবারেই নতুন, পণ্যের ক্রেতা সেটি পরিচালনা পদ্ধতি সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ থাকেন।

একটি ঘটনা শোনা যায় যে, যখন ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম মোটরগাড়ি আসে তখন চালনা সম্পর্কে মানুষের কোনো ধারণাই ছিল না। তাই গাড়ি সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গাড়ি চালানোর জন্য ড্রাইভার সরবরাহ করত। তো কোনো এক নবাব এবকটি গাড়ি ক্রয় করলেন। সেই সাথে একজন ড্রাইভার ও আনলেন। ড্রাইভার ছিল অতি ধূর্ত। সে জানতো নবাব গাড়ি সম্পর্কে একদম কিছুই জানেনা। তাই নবাব যখন একদিন বললেন, 'এই তাড়াতাড়ি গাড়ি বের কর আমার বেগম এখন বাইরে যাবে।' তখন ড্রাইভার বলল গাড়ি নষ্ট হয়ে গেছে। ঠিক করতে ১০ কেজি খাঁটি ঘি, ২০ কেজি সরু চাল, ২০ কেজি তেল প্রয়োজন। নবাব তাকে তাই দেবার নির্দেশ। দিলেন। চিন্তা করুন তো আপনার গাড়ি ড্রাইভার যদি আপনাকে বলে গাড়ি মেরামত করতে ১০ কেঝি ঘি, ২০ কেজি চাল ও ২০ কেজি তেল লাগবে তখন আপনি তাকে কী করবে? আপনি অবশ্যই তার প্রতারণা বুঝতে পারবেন। কারণ, বর্তমানে আমাদের গাড়ি সম্পর্কে বেশ ধারণা আছে। তাই আপনি গাড়ি সংক্রান্ত কোনো বিশেষ সমস্যায় পড়লেই অভিজ্ঞ কারো কাছে যাবেন। তেমনি মুসলমানদেরও কোরআন সম্পর্কে বেশ ভালো ধারণা ও ব্যুৎপত্তি থাকা দরকার যেন সব সময় অন্যের দ্বারস্থ হতে না হয়।

অনেকে কোরআন না বুঝে তিলাওয়াত করার এক অদ্ভুত অজুহাত খাড়া করে। তারা বলে, যদি কেউ কোরআন বুঝে অপরাধ করে তার সাজা অধিক, আর না বুঝে অপরাধ করলে সাজা কম। তাই বেশি না বোঝাই ভালো। আমি তাদের সামনে একটি উদাহরণ দিচ্ছি। আইনে আছে, যখন কোনো ড্রাইভার গাড়ি চালানোর প্রশিক্ষণকালে অর্থাৎ শিক্ষানবিশ সময়ে কোনো দুর্ঘটনা ঘটায়, তবে তার জরিমানা যে ব্যক্তি ঐ প্রশিক্ষণ শেষ করেছে তার অর্ধেক। ধরা যাক, যে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে অর্থাৎ পাকা ড্রাইভার সে দুর্ঘটনা করলে জরিমানা ২ হাজার টাকা আর শিক্ষানবিস ঐ একই ধরনের দুর্ঘটনা ঘটালে জরিমানা ১ হাজার টাকা।

এখন কেউ যদি মনে করে যেহেতু শিক্ষানবিশের জন্য জরিমানা কম তাই প্রশিক্ষণ শেষ না করে শিক্ষানবিশ থাকাই ভালো। তখন সে কি লাভবান করে? যে প্রশিক্ষণ শেষ করেছে সে পাকা ড্রাইভার হওয়ায় হয়তো বছরে একবার দুর্ঘটনা ঘটালো। তখন তাকে জরিমানা দিতে হবে দু হাজার টাকা কারণে। আর যে শিক্ষানবিশ অর্থাৎ কাঁটা ড্রাইভার সে অপরিপক্ক হওয়া ৫০টি দুর্ঘটনা, ঘটালে তাকে কত টাকা মাশুল গুনতে হবে? নিশ্চয়ই ৫০ হাজার টাকা। তাহলে লাভ করা বেশি। যে প্রশিক্ষণ শেষ করে পাকা ড্রাইভার হলো তার নাকি যে চালাকি করে শেষ করলো না তার? তেমনিভাবে যারা কোরআন বুঝে তিলাওয়াত করে যে গুনাহ বেশি হওয়ার খোড়া অজুহাত খাড়া করে না বুঝটাকেই ভালো মনে করেন তাদের অবস্থাটা কিন্তু শিক্ষানবিস ড্রাইভাবের চেয়ে খুব একটা ভালো হবে না।

মানবজাতির ম্যানুয়াল আল কোরআন

আপনি যদি আরবদেশগুলোতে পবিত্র কোরআনের তেলাওয়াত গেলে দেখবেন সেখানে নামাজের জন্য মসজিদে গিয়ে জামাআত শুরু হওয়ার আগ পর্যন্ত কেউ শুধু শুধু বসে নেই। সবাই কোরআন তিলাওয়াত ব্যস্ত। যেহেতু তারা আরবিভাষী, তারা কোরআন বুঝেই তিলাওয়াত করতে পারেন। আমাদের এখানে ক'জন আছেন জামাআতে শুরু হওয়ার আগের সময়টুকুতে কোরআন তিলাওয়াত ও বোঝার কাজে ব্যয় করতে? যদি কেউ করেও থাকেন তবে সেটা সামনের কাতারের দু এক জনের বেশি নয়। পেছনের কাতারের কেউ এ কাজটি করেন না। যদি দ্বিতীয় বা তৃতীয় কাতারে কেউ তেলাওয়াত করতে থাকেন তবে অনেকেই এসে আপত্তি তোলেন যে, সামনের কাতারের লোকদের পেছন দিকটা কোরআনের দিকে পড়ে বলে কখনো ২য় বা ৩য় কাতারে বসে এভাবে কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত নয়।

আমি মসজিদে হারামে গিয়ে দেখিছি সেখানে যখন কোরআনের দারস হয় তখন অনেকেই কোরআন হাতে রাখেন যাদের সামনের লোকগুলোর পেছন দিকটা কোরআনের দিকে ফেরানো। এতে সমস্যাটা কী? লোকগুলো তো কোরআনকে অবমাননা করার এজন্য এমনটা করছে না। বরং নিজেদের বসার সুবিধার জন্য যাতে ভালো করে দারসে মনোনিবেশ করতে পারে ও কোরআন ভালোভাবে বুঝতে পারে। এজন্য এমন করে বসা দোষের মধ্যে পড়ে না।

আমাদের ভারতবর্ষের কোনো লোক যদি পবিত্র কোরআন সামনে নিয়ে কা'বাকে পেছন দিক ফিরে বসে থাকে তবে তর স্থান আর ভারতবর্ষে থাকবে না। সবাই মিলে তাকে বহিস্কার করে দেবে। অথচ হারাম শরীফে আমি বহুলোককে দেখেছি কা'বাকে পেছন ফিরে বসতে। অথচ এসব সূত্র নিয়মাবলী নিয়ে বাড়াবাড়ি ও ভুল বোঝাবুঝি মুসলিম উম্মাহ্‌কে গ্রাস করেছে। আমরা কতই দুর্ভাগ।

ভারতবর্ষের একজন ইমাম ছিলেন যাঁর তিলাওয়াত ছিল অত্যন্ত সুন্দর শ্রুতিমধুর। তিনি সৌদি আরব গেলে সেখানকার ইমাম সাহেব তাঁকে নামাযে ইমামতি করতে দিলেন। নামায শেষ হলে একজন আরব তাঁর দিকে তাকিয়ে হো হো করে হেসে ওঠে। তখন তিনি তার কাছে এর কারণ জানতে চাইলে লোকটি বলে, "আপনার তিলাওয়াত খুব মিষ্টি। তবে আপনি নামাযের মধ্যে মূসা (আ)-কে যে মাঠে নিয়ে গেলেন, আরতো ফিরিয়ে আনলেন না।"

তখন আমাম সাহেব বুঝতে পারেলেন যে, আরবরা নামাযে কত মনোযোগ দিয়ে কোরআন তেলাওয়াত শুনে থাকে। এমন কি নামাযের মধ্যে কোনোভাবের অসঙ্গতি রেখে তারা কোরআন শেষ করে না। কেনইবা তারা কেরাআন বুঝে তিলাওয়াত বা শ্রবণ করবে যেখানে আল্লাহ্ স্বয়ং এ বিষয়ে তাকিদ দিয়েছেন। মহান আল্লাহ্ পবিত্র কেরাআনের সূরা মুহাম্মাদের ২৪ নং আয়াতে

اَفَلَا يَتَدَبَّرُوْنَ الْقُرْاٰنَ ـ

অর্থ : "তারা কি কোরআন সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা করে না?" ....

সূরা বাকারাহ্ ১৫৯ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْتُمُوْنَ مَا اَنْزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنٰتِ وَالْهُدٰى مِنْۢ بَعْدِ مَا بَيَّنّٰهُ لِلنَّاسِ فِى الْكِتٰبِ اُولٰٓئِكَ يَلْعَنُهُمُ اللّٰهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللّٰعِنُوْنَ ـ

অর্থ : "নিশ্চয় আমি মানুষের জন্য যে সকল হেদায়েতের তত্ত্ব বিস্তারিতভাবে কিতাবের মধ্যে নাযিল করেছি, যারা তো গোপন করে তাদের প্রতি আল্লাহর ও অন্যান্য অভিসম্পাতকারীর অভিশাপ।"

অর্থাৎ কোরআনের ভাব অনুযায়ী যারা কোরআনের আয়াত গোপন করে তারা অভিশপ্ত। সূরা ফুরক্বান-এর ৩০ নং আয়াত এ বলা হয়েছে,

وَقَالَ الرَّسُوْلُ يٰرَبِّ اِنَّ قَوْمِى اتَّخَذُوْا هٰذَا الْقُرْاٰنَ مَهْجُوْرًا ـ

অর্থ : "হে আমার পালনকর্তা আমার সম্প্রদায় কোরআনকে প্রলাপ হিসেবে গণ্য করেছে।"

এখানে 'সম্প্রদায়' বলতে কোরাইশদের কথা বলা হয়েছে। চিন্তা করুন, কোরআনের বার্তাবাহক পর্যন্ত আশঙ্কা করেন যে মানুষ হয়তো কোরআনকে প্রলাপ ভাবতে পারে।

কোরআন তিলাওয়াতের কতিপয় উপায়

পবিত্র কোরআন নানান ভাবেই তিলাওয়াত করা যায়। যেমন আয়াতগুলো শুধু অর্থসহ মোটামুটি পড়ে যাওয়া। এটা খুবই সহজ এবং এতে অনেক সময়ও লাগে না। একজন মানুষ অল্প কয়েক দিনেই এভাবে সম্পূর্ণ কেরাআন তেলাওয়াত করতে পারবে। আরেকটি হচ্ছে গভীর জ্ঞানের সাথে পড়া। পবিত্র কোরআনের প্রত্যেকটি আয়াত গভীরভাবে অর্থ বুঝে তিলাওয়াত করা। এভাবে তিলাওয়াত করে কেউ কোনো দিনই বলতে পারবে না, তিনি পবিত্র কোরআন সম্পূর্ণ শেষ করতে পেরেছেন। এভাবে গভীর অর্থসহ আপনি যত পড়বেন ততই নতুন নতুন পথ আপনার সামনে উন্মোচিত হবে। আপনি এক হাজার বারও তিলাওয়াত করলেও প্রতি বারই মনে হবে আপনি নতুন কিছু পড়ছেন যা আগে বোঝেননি। এভাবে কোরআনের গভীর অর্থ অনুধাবনের প্রচেষ্টা চলতেই থাকবে, কখনো শেষ হবে না। আমাদের প্রতিদিনই কোরআন তিলাওয়াত করা উচিত।

আমাদের দরকার প্রত্যেক পরিবারের কমপক্ষে একটি কোরআন পবিত্র ভাষা আরবিসহ যে যে ভাষা বুঝে সে সে ভাষায় অনুবাদসহ ঘরে রাখা। অনেকের বইয়ের তাকে কোরআনের অনুবাদ সাজানো থাকে, কিন্তু কখনো ছুঁয়েও দেখে না। এতে লাভ কি? অবশ্যই আমাদের কোরআন বুঝে পড়ার অভ্যাস করতে হবে। আমাদের প্রথম পছন্দ হোক আল-কোরআন। আপনার সন্তানের জন্য প্রথম বইটি হোক কোরআন। আপনার সন্তানের জন্য প্রথম

উপহারটি হোক কোরআন। এর অর্থ কী? এর অর্থ ও তাৎপর্য হচ্ছে শুরু থেকেই আপনি আপনার সন্তানকে কল্যাণ ও সত্যের দিকে ভবিষ্যতের সুন্দর পথ খুলে দিলেন। যখন আপনার সন্তান বর্ণমালা শেখা শুরু করে তখন অন্য বর্ণমালার পাশাপাশি আরবি বর্ণমালাগুলোও শেখান। ছোটবেলা থেকেই আরবিকে একটি ভাষা হিসেবে শেখাতে শুরু করুন। ছোট বেলায় ভাষা শেখা যতটা সহজ বয়স বেশি হলে তা অনেক কঠিন হয়ে পড়ে। অনেকে তাদের সন্তানদের মাদরাসায় পাঠান। আল-হামদুলিল্লাহ্, আমি তাদের প্রশংসা করি। কিন্তু আমার কথা হচ্ছে, শুধু মাদরাসায় পাঠিয়েই কি শেষ?

পরিবারের সবাই মিলে কি কখনো কোরআন তিলাওয়াত করা হয়? হ্যাঁ, এটাও পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের একটি গুরুত্বপূর্ণ পদ্ধতি। পরিবারের সবাই ফজরের নামায বা এশার নামায বা অন্য যে কোনো সুবিধা মতো সময়ে যদি প্রতিদিন এক অন্তত রুকু অর্থসহ কোরআন তেলাওয়াত করা হয় তাহলে সহজেই কোরআন তেলাওয়াত শেষ হয়ে যাবে। এভাবে মাত্র দু বছরেই আমর পবিত্র কোরআন একবার তেলাওয়াত শেষ করতে পারি। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ফাউন্ডেশনে একটি নিয়ম চালু রয়েছে। আমাদের এখানে যখন কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী প্রবেশ করেন তখন সাথে সাথেই তাকে তার কার্ডটি ঘষতে হয়। এতে আপনা থেকেই কম্পিউটারে রেকর্ড হয়ে যাবে এ কর্মকর্তা বা কর্মচারী কয়টার সময় অফিসে গেলেন। এরপর তার প্রথম কাজটি পবিত্র কেরাআনের ১ রুকু অনুবাদসহ তিলাওয়াত করতে হয়। তারপর অফিসের কাজ শুরু করতে হয়। আমার মনে হয় আমরা সকলেই আমাদের প্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় ক্ষেত্রে এ চালু করতে পারি।

অনেকে বলেন, আমার প্রতিষ্ঠানে অনেক লোকবল। তারা সবাই মিলে ১৫-২০ মিনিট এভাবে ব্যয় করলে অনেক টাকাই শুধু শুধু ব্যয় হয়ে গেল না? আমি তাদের বলা আপনি এ সময়টা ব্যয় ধরছেন কেন? আপনি এটাকে বিনিয়োগ হিসেবে ধরুণ। পবিত্র কোরআন থেকে সত্যবাদিহা ও অফিসে কর্তব্য পালন, ঘুষ নেওয়ার শাস্তি ইত্যাদি সম্পর্কে তারা যে ধারণা পাবে তা অনেক উপকারে আসবে। ঘুষ সম্পর্কে সূরা বাকারার ১৮৮ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَلَا تَاْكُلُوْٓا اَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَآ اِلَى الْحُكَّامِ لِتَاْكُلُوْا فَرِيْقًا مِّنْ اَمْوَالِ النَّاسِ بِالْاِثْمِ وَاَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ۔

অর্থ ঃ "তোমরা অন্যায়ভাবে একে অন্যের সম্পদ ভোগ করো না। জনগণের সম্পদের সামান্য অংশও অন্যায়ভাবে আত্মসাৎ করার জন্য কর্তৃপক্ষের হাতে তুলে দিও না।"

তাই পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের কারণে কর্মকর্তা-কর্মচারীদের মধ্যে কাজে যে একাগ্রতা, একনিষ্ঠতা ও কর্তব্যবোধ আসবে তা আপনার ১৫-২০ মিনিটের অভাবকে মুছে দেবে। এছাড়া এটা একটা বড় বিনিয়োগও বটে। মহান আল্লাহ সূরা বাকারার ২৬১ নং আয়াত এরশাদ করেন,

مَثَلُ الَّذِيْنَ يُنْفِقُوْنَ اَمْوَالَهُمْ فِىْ سَبِيْلِ اللّٰهِ كَمَثَلِ حَبَّةٍ اَنْۢبَتَتْ سَبْعَ سَنَابِلَ فِىْ كُلِّ سُنْۢبُلَةٍ مِّائَةُ حَبَّةٍ۔

"যারা আল্লাহর রাস্তায় নিজের সম্পদ ব্যয় করে তাদের উদাহরণ একটি বীজের মতো যা থেকে সাতটি শীষ বের হয় এবং প্রত্যেক শীষে একশতটি দানা থাকে।"

অতএব ১৫ থেকে ২০ মিনিট কোরআন তিলাওয়াতের জন্য রাখলে ব্যবসায় বা প্রতিষ্ঠানে ক্ষতি হয়ে যাবে এমন ভাবটি একেবারেই যুক্তি যুক্ত নয়। আমাদের অনেকে আবার বলেন, জাকির ভাই, আমার প্রতিষ্ঠানে অনেক অমুসলিম লোকজন আছে। আমি বলি তাদেরকেও অনুবাদিত কোরআন দিন এবং বলুন কোন অংশ তাদের কাছে ভুল বা অসঙ্গত মনে হয় তা খুজে বের করে। তার জবাব দিন, কোরআনের যথার্থতা বুঝিয়ে বলুন। আপনি নিজে না পারলে যিনি জানেন তার কাছে যান। আমাদের ফাউন্ডেশনে আসুন। আলহামদুলিল্লাহ, আমাদের ফাউন্ডেশনে অমুসলিমদের মনে ইসলাম ও কোরআন সম্পর্কে কী প্রশ্ন থাকতে পারে তা নিয়ে বিশেষ কর্মসূচি চালু আছে। অতএব, এখানে আসতে পারেন। আসলে ইচ্ছেটাই হলে, মূলকথা।

কোরআনের অনুবাদ নির্বাচন

অনেকে বলেন, কোন ভাষায় বা কার অনুবাদ পড়বো? আমি ইংরেজি অনুবাদগুলো সম্পর্কে বলবো। যেহেতু আমার বক্তব্য ইংরেজিতে হয়। তবে একটা কথা সব সময় মাথায় রাখতে হবে, কোনো অনুবাদই শত ভাগ নির্ভুল নয়। কেননা এগুলো মানুষের লেখা আর মানুষ কখন ভুলের উর্ধ্বে নয়। তবে আমি শুধু অনুবাদগুলোর সুবিধা নিয়েই কথাই বলবো, দুর্বলতা নিয়ে কিছু বলবো না। অনুবাদ পড়ার বেলায় অনেকেই প্রাচীনত্বকে গুরুত্ব দেন। অর্থাৎ যত প্রাচীন অনুবাদ, ততই গ্রহণযোগ্য। আমার কিন্তু মনে হয় নতুন অনুবাদও ভালো হতে পারে। যেহেতু পুরাতন অনুবাদ পড়ে তাদের দুর্বলতা অনুধাবন করে সেগুলোর প্রতি লক্ষ্য রেখেনতুনবা লিখতে বসেন। তাই নতুন অনুবাদও ভালো হতে পারে। অনেকে আবার সর্বজন গ্রহণযোগ্যতার ব্যাপরটি দেখেন অর্থাৎ কত জন মানুষ এটাকে গ্রহণ করেছে। হ্যাঁ, এটাও একটা ভালো দিক। যে বিষয়টি অনেকেই গ্রহণ করেছে আপনিও সেটি নিতে পারেন। তবে মূলকথা হচ্ছে কোনোটিই শতভাগ শুদ্ধ নয়। শুধু আল্লাহ্‌র নাযলকৃত মূল আরবি কোরআনটিই একশো ভাগ পরিশুদ্ধ।

ইংরেজি ভাসায় অনূদিত কোরআনগুলোর মধ্যে আব্দুল্লাহ্ ইউসুফের অনুবাদটি সবচেয়ে বেশি প্রচলিত। এটি বেশ সহজ বোধ্য, না বেশি সংক্ষিপ্ত আবার না বেশি বিস্তৃত। মধ্যম ধরণের এবং বেশ প্রাঞ্জল।

এরপর আসে আবুল কাশেম অনূদিত তাফসরটির কথা বলও যায়। এটি একেবারেই নতুন প্রকাশক। এটি আমকে দিয়েছেন পড়ার জন্য এবং আপনাদের এটি সম্পর্কে জানানোর জন্য। এটিও আপনারা পড়তে পারেন।

কুরতুবি, ইবনে কাসির ইত্যাদির সাথে সঙ্গতি রেখে এ অনুবাদটিও সুন্দর। এটির আরেকটি বৈশিষ্ট হচ্ছে, কোরআনের আলোচনার সাথে সাথে বুখারী শরীফের সংশ্লিষ্ট বিষয়ক হাদিসগুলোও এতে সন্নিবেশিত হয়েছে। ফলে একই সাথে বুখারি শরীফ সম্পর্কে সম্যক ধারণা ও জ্ঞান পাওয়া যাবে।

এছাড়া আপনি আমার হাতের সাথে রাখতে পারেনএ ছোট সংস্করণটি সাথে রাখতে পারেন। এটি ছোট, সহজে বহনযোগ্য এবং সব জায়গায় নেওয়ার মতো। আপনারা দেখবেন বাইবেলসহ অনেক ধর্মীয় বইয়ের এরকম সংক্ষিপ্ত সংস্করণ থাকে যা পকেটে বহনযোগ্য। এর পৃষ্ঠাগুলো উন্নত, কিন্তু পাতলা তাই এতো ছোট। এর মধ্যে সম্পূর্ণ কোরআন অনুবাদসহ দেওয়া আছে। আমার দেখা অনুবাদসহ আয়তনে সবচেয়ে ছোট কোরআন এটিই। এটি কাছে রাখলে বাস, ট্রেন ইত্যাদিতে বসে অযথা অলস সময় নষ্ট না করে অহেতুক বাজে চিন্তা বাদ দিয়ে কোরআন তিলাওয়াত করতে পারেন।

'দ্যা মেসেজ অব দ্যা হলি কোরআন' নামের এ অনুবাদটিও পড়া যেতে পারে। এটি যুক্তিসঙ্গত দিকগুলো অর্থাৎ কোরআনকে যৌক্তিক ভাষায় ব্যাখ্যা করা হয়েছে। এটি একজন বিখ্যাত ইহুদি সাহিত্যিক কর্তৃক লিখিত যিনি পরে মুসলিম হয়েছেন।

আবদুল মজিদ দরিয়াবাদী লিখিত চার খণ্ডের তাফসীরগ্রন্থ 'তাফসিরুল কোরআন'টিও পড়তে পারেন। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশের আরো লিখিত ইংরেজিতে কোরআনের তাফসীরের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য একটি। এছাড়া মাহমুদুল হক লিখিত এ অনুবাদটিও বেশ ভালো ও এর ভাষা সহজ সরল।

অনেক অমুসলিমই পবিত্র কোরআন অনুবাদ করেছেন। তবে ধর্মীয় জ্ঞানের অজ্ঞতার কারণে তাদের অনুবাদে অনেক ভুল লক্ষ্য করা যায়। তবে অমুসলিমদের মধ্যে তুলনামূল বেশি নির্ভরযোগ্য যে অনুবাদটি আমার জানা মতে সেটি হচ্ছে আর্থার আব্রিব এর করা অনুবাদ। এতে কোরআনের কাব্যিক ভাবটি ধরে রাখার অনেকটাই চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও আরবির কাব্যিকভাব ইংরেজিতে ফুটিয়ে তোলা খুব কঠিন, তবুও লেখক সেই কাজটিই বেশ কষ্টের সাথে হলেও করার চেষ্টা করেছেন।

এড্ডুইন নামের একজন আমেরিকান খ্রিষ্টান কিন্তু পবিত্র কোরআন তিলাওয়াত ও বোধগম্য তার মাধ্যমেই মুসলিমে রূপান্তরিত হয়েছেন। তাঁর বর্তমান নাম আলহাজ্জ তালেব আলী। তাঁর অনূদিত এ কোরআনটি বেশ সহজ সরল এবং আমেরিকানদের ব্যবহৃত কথ্য ভাষা এতে ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় এটি করতে গিয়ে বেশ হালকা শব্দও ব্যবহার করা হয়েছে। অনেক সময় এটি করতে গিয়ে বেশ হালকা শব্দও ব্যবহার করেছেন। কোনো আমেরিকান লিখিত কোরআনের প্রথম অনুবাদ হিসেবে এটি স্বীকৃত।

কেউ যদি ইংরেজিতে অনূদিত কোরআন পড়তে চান তবে তার সরাসরি আরবি থেকে ইংরেজিতে অনুবাদ করা কোরআন পড়াই ভালো। কেননা আরবি ভাষা থেকে অন্য ভাষায় তারপর আবার ইংরেজিতে অনূদিত হলে তার মধ্যে অসামঞ্জস্যতার সম্ভাবনা অনেক অংশে বেড়ে যায় এরপরও অন্য ভাষা থেকে ইংরেজিতে অনূদিত কোরআনের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর লিখিত তাফসীর 'তাফহীমুল কোরআন' বেশ প্রচলিত। মূল তাফসীরটি উর্দু ভাষায় লিখিত। এটি দুজন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছেন। মুহাম্মদ আখতার ৭ খণ্ডে ফাযরী শাহ্ আনসারী ৫ খণ্ডে। ঐতিহাসিক ঘটনা, নাজিলের সময় অবস্থান ইত্যাদি জানতে চাইলে এটি থেকে বেশি কোরআনের মধ্যে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ'লা মওদুদীর লিখিত। এটি দুজন ইংরেজিতে অনুবাদ করেছে। মুহাম্মদ আখতার ৭ খণ্ডে ফাযরী শাহ্ আনসারী ৫ খণ্ডে। আনসারীর ৫ খণ্ডের অনুবাদটি বেশি সংক্ষিপ্ত। কোরআনের আয়াতগুলো মানে নজুল, ঐতিহাসিক ঘটনা, নাজিলের সময়, অবস্থান ইত্যাদি জানতে চাইলে এটি থেকে বেশি উপকার পাবেন। কোরআনের আয়াতগুলো নাযিলের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এটিতে অনেক সাবলীল ভাষায় বর্ণীত হয়েছে। আমি নিজে অবশ্য এটির ইংরেজি অনুবাদ পড়িনি।

এছাড় আবদুল করিম অনূদিত উর্দু ভাষা রচিত 'দাওয়াত কোরআন' এর ইংরেজি অনুবাদ পড়তে পারেন। তবে একটি কথা আবারও আর তা হচ্ছে কোনো অনুবাদই শতভাগ বিশুদ্ধ নয়। কিছু কিছু ভুল থাকেই, কারণ এগুলো মানব রচিত। আর কোনো মানুষই ভুলের উর্ধ্বে নয়। আল্লাহ তাআলা পবিত্র কোরআনের সূরা হাশর-এর ২১ নং আয়াতে বলেন,

لَوْ أَنْزَلْنَا هٰذَا الْقُرْاٰنَ عَلٰى جَبَلٍ لَّرَاَيْتَهٗ خَاشِعًا مُّتَصَدِّعًا مِّنْ خَشْيَةِ اللّٰهِ.

অর্থ ঃ "আর যদি আমি এ কোরআন কোন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম, তাহলে দেখতে পাহাড় চিন্তিত হয়ে আল্লাহর ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।"

মহান আল্লাহ্ এখানে পাহাড়ের কথা উল্লেখ করেছেন কেননা পাহাড় হচ্ছে স্থির ও শক্তভাবে দণ্ডায়মান। উচ্চশীর, কঠিন ও কাঠিন্যের প্রতীক, পাহাড় আরোহণ অনেক কঠিন একটি কাজ। আল্লাহ্ তাই পাহাড়ের উদাহরণ দেয়ার মাধ্যমে বুঝতে চান পাহাড়ের মতো শক্ত, কঠিন, উচ্চ ও দুর্দমনীয় জিনিসও কোরআনের ভাব বহনে অক্ষম ও অপরাগ। তাই মানুষের জন্য সত্যই এটি তুচ্ছ কোনো কিছু নয়। আল্লাহ্ তাআলা সূরা নাহল- এর ১২ নং আয়াতে বলেন,

اِنَّ فِىْ ذٰلِكَ لَاٰيٰتٍ لِّقَوْمٍ يَّعْقِلُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় এতে জ্ঞানীদের সম্পন্নদের জন্য আছে নিদর্শনাবলি।

তাই আমি আশা রাখি মুসলিম ভাইয়েরা পবিত্র কোরআন বুঝে পড়ার দিকে মনোযোগী হবেন। চলে যাওয়া দিনগুলোর কথা না ভেবে আজ থেকে বাকী দিনগুলোতে আমরা নিয়মিতভাবে কোরআন তিলাওয়াত করবো, বুঝবো এবং সে অনুযায়ী আমল করবো যে প্রতীজ্ঞা করুন। প্রথমত আমাদের কাজ হচ্ছে পবিত্র কোরআনের অর্থ বুঝতে পারা, এরপর আমাদের দায়িত্ব সে অনুযায়ী আমল করা। আমি আজকের আলোচনা শেষ করতে চাই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একটি হাদিস দিয়ে বুখারী শরীফের ৬ষ্ঠ খণ্ড হাদিস নং ৫৪৫ এ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন,

'তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম সেই যে পবিত্র কোরআন বুঝে পড়ে ও অন্যদের সেভাবে বোঝায়।'

তাই আমরা সকলে কোরআন বোধগম্যতার সাথে পড়ার উদ্যোগী হবো সে আশা আমি সবার কাছে করতে পারি। এখানেই আমার বক্তব্য শেষ করছি। ওয়া আখির .... আলামিন।

প্রশ্নোত্তর পর্ব

সূরার শুরুতে বিচ্ছিন্ন বর্ণ সমষ্টি; তাৎপর্য ও অর্থ

অর্থ ঃ পবিত্র কোরআনের অনেকগুলো সূরার শুরুতে الٓمٓ এসেছে। এগুলো কেন? এর অর্থই বা কী?

উত্তর ঃ পবিত্র কোরআনের অনেক সূরার শুরুতে কিছু বিক্ষিপ্ত বর্ণ এসেছে এখানে কথা হচ্ছে সেগুলো নিয়ে। এ হরফগুলোকে হরুকে মুকাত্ত্বাআত বা বিচ্ছিন্ন বর্ণমা বলা হয়। এগুলো নিয়ে অনেক আলোচনা আছে। এমন কি অনেক বইও লিখিত হয়েছে। সেগুলোতে বিস্তারিত বর্ণনা আছে। মোট আরবি বর্ণমালা ২৯টি। সূরার শুরুতে ১টি থেকে সর্বোচ্চ ৫টি বর্ণ পর্যন্ত আছে। যেমন ১টি করে বর্ণ আছে ৩টি সূরায় সেগুলো হলো নুন, ছোয়াদ ও ক্বফ। দুটি বর্ণ আছে ১০টি সূরায় যেমনন : (ত্বোয়া হা,) (ইয়াছিন) ইত্যাদি ৩টি বর্ণ আছে। বেশ কয়েকটি সূরায়। যেমন : ৬টি সূরায় আলিফ, লা, মিম ৬টি সূরায় আলিফ, লাম, রা এবং ২টি সূরায় তোয়া, সিন, জীম আবার ২টি সূরায় ৪টি বর্ণ এবং ৫টি বর্ণ আছে।

এখন প্রশ্নকারীর প্রশ্ন, এগুলোর অর্থ কী? আমি আগেই বলেছি এগুলো নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা অনেক বড়। বিভিন্ন জন বিভিন্নভাবে এর ব্যাখ্যা করেছেন। কেউ কেউ বলেন ن দ্বারা نُوْر তথা আলোক রশ্মি বুঝানো হয়েছে, এমনিভাবে একেক বর্ণের দ্বারা তারা একেকটি শব্দ নির্দেশ করেন, কেউ কেউ মনে করেন, এগুলো আল্লাহর গুণবাচক নাম (সিফাত)। কারো কারো ব্যাখ্যা মতে কোনো কোনটি আল্লাহর নাম হিসেবে, কোনোটি রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নাম হিসেবে আবার কোনোটি কোরআনের নাম হিসেবে এসেছে। কেউ কেউ

মনে করেন, এগুলো সূরার নামকরণের জন্য করা হয়েছে। যেমন: সূরা ইয়াছিন, সূরা নূর, সূরা ছোয়াদ, সূরা ত্বোহা ইত্যাদি। অনেকে আবার ভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে ব্যাখ্যা করার প্রয়াস পেয়েছেন। তারা বলেন, এগুলো হচ্ছে বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ সংখ্যা নির্দেশক বর্ণমালা। কিছু কিছু মুফাসসীর মত দেন যে, এগুলো হযরত জিবরাঈল (আ) মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য পড়েছিলেন। আর আমরা তিলাওয়াত করি মনোযোগ সৃষ্টির জন্য।

একটি প্রকাশ্য চ্যালেঞ্জ

তবে আমি আল্লাহ্ তাইমিয়ার সাথে একমত পোষণ করি যিনি বলেছেন, এগুলো দ্বারা মূলত আল্লাহ্ আরবদের বুঝিয়েছেন।

অর্থাৎ আরবদের বলছেন আমি কোরআন অবতীর্ণ দিয়েই। তোমরা তোমাদের কথায়, লেখায়, ভাষায় যে বর্ণসমষ্টি, যেমন আলিফ, ছোয়াদ, তোয়া, নূন ব্যবহার কর আমার কোরআনও সেই বর্ণমালায় সাহায্যে নাযিল হয়েছে। এখন তোমরা যদি বিশ্বাস না কর এটা আল্লাহর বাণী, তবে ঐ একই বর্ণমালা দিয়ে তোমরা একটা সূরা একটা আয়াত ইত্যাদি রচনা করে দেখাও। এ চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া জন্যই মূলত এ বর্ণগুলো ব্যবহৃত হয়েছে, যে তোমাদের বর্ণ আর আমার বর্ণ ভিন্ন নয়।

সূরা আলে ইমরানের ৭ নং আয়াতে বলেন,

هُوَ الَّذِیْٓ اَنْزَلَ عَلَیْكَ الْكِتٰبَ مِنْهُ اٰیٰتٌ مُّحْكَمٰتٌ هُنَّ اُمُّ الْكِتٰبِ وَاُخَرُ مُتَشٰبِهٰتٌ ۔

অর্থ ঃ "তিনি আপনার প্রতি কিতাব নাযিল করেছেন যার কিছু অংশ সুস্পষ্ট এবং এটি আসল অংশ, অন্যগুলো অস্পষ্ট (রূপক)।"

অর্থাৎ কিছু বর্ণ প্রতিষ্ঠিত ও সর্বজন বোধগম্যতা সমৃদ্ধ। যেমন : قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ 'বলুন আল্লাহ এক'। এটি সবাই বুঝে আবার কিছু আয়াত আছে যেগুলো অস্পষ্ট সবাই বুঝতে পারে না। যেমন : = (আলিফ, লাম, মীম) এ আয়াতগুলোর ব্যাখ্যা কোরআনের অন্য আয়াতের সাহায্যে করতে হয়। কোরআনের এটি একটি উল্লেখযোগ্য দিক যে যখন একটি আয়াত পড়তে গিয়ে কোনো প্রশ্নের সম্মুখীন হয় এবং সেটির উত্তর ঐ আয়াতেই পাওয়া যায় না, তখন দেখা যায় অন্য আয়াতে ঠিকই তার উত্তর দেওয়া রয়েছে। এখন আমরা যদি বলি আল্লাহ্ এভাবেই কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন অন্য আয়াতে। যেমন সূরা বাকারায় ২৩-২৪ নং আয়াতে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِیْ رَیْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰی عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ وَادْعُوْا شُهَدَآءَكُمْ مِّنْ دُوْنِ اللّٰهِ اِنْ كُنْتُمْ صٰدِقِیْنَ ۔ فَاِنْ لَّمْ تَفْعَلُوْا وَلَنْ تَفْعَلُوْا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِیْ وَقُوْدُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ اُعِدَّتْ لِلْكٰفِرِیْنَ ۔

অর্থ ঃ "আর যদি তোমাদের সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দা (মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম--এর ওপর নাযিল করেছি, তবে তোমরা এর একটি সূরার অনুরূপ একটি সূরা রচনা করে দেখাও তোমরা তোমাদের সাহায্যকারীদের সাথে নাও, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর যদি তোমরা তা না পারো, জেনে রেখো অবশ্যই পারবে না, তবে ভয় কর সেই আগুনকে যার ইন্ধন হচ্ছে মানুষ আর পাথর যা অবিশ্বাসীদের জন্য।"

আল্লাহ্ মানুষকে কোথাও দশটি সূরা আবার কোথাও একটি আয়াত রচনার চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন। এভাবে আল্লাহ্ মূলত মানুষকে বুঝতে চান মানুষের বর্ণিত, লিখিত ও পঠিত বর্ণমালা আলিফ, লাম ইত্যাদিই আমি ব্যবহার করে কোরআন নাযিল করেছেন অথচ মানুষ এগুলো ব্যবহার করে একটি ছোট আয়াতও রচনা করতে ব্যর্থ। আসলে এই যে বর্ণগুলো ইংরেজি বর্ণমালার কথা ধরলে আমরা বলতে পারি, a, b, c, e, f, ইত্যাদির কথা। এই একই বর্ণমালা ব্যবহার করে সবাই কি মনের ভাব প্রকাশ করতে পারে?

উদাহরণ স্বরূপ যে উপাদানগুলো দ্বারা মানুষ তৈরি মাটি ও পৃথিবীর সৃষ্টিতেও প্রায় সে একই ধরনের উপাদান আছে। মানুষের শরীর যে সকল উপাদান দিয়ে গঠিত তা আপনি কম-বেশি কয়েক হাজার টাকা হলেই কিনতে পারবেন। এর অর্থ কি এই দাঁড়ায় যে, আপনি মানুষ তৈরি করতে পারেন? অবশ্যই না। আপনি কোনোভাবেই প্রাণ দিতে পারবেন না। যদিও সকল উপাদানই আপনার হাতে রয়েছে তবুও আপনি পারবেন না। অনুরূপভাবে আল্লাহ্ও বলেন, 'তোমরা যে আলিফ, নাম, নূন, মীম ইত্যাদি বর্ণমালা ব্যবহার কর আমিও তাই ব্যবহার করেছি। পারলে তোমরা একটি সূরা বা আয়াত রচনা করে দেখাও।' সেই চ্যালেঞ্জটি প্রতিষ্ঠার জন্য এ বর্ণমালাগুলো হতে পারে। যেমন: আমরা দেখতে পাই সাধারণত এই ইরার إِعْرَابُ বা বর্ণ বিন্যস্ত আয়াতগুলোর পরপরই কোরআনের মহিমা বর্ণিত আয়াতগুলো রয়েছে। যেমন: সূরা বাকারার ১ ও ২ নং আয়াত, যেখানে প্রথম আয়াতে আলিফ, লাম, মীম বলেই ২য় আয়াতে আল্লাহ্ উল্লেখ করেন।

الٓمٓ ۔ ذٰلِكَ الْكِتٰبُ لَا رَيْبَ فِيْهِ ۔ هُدًى لِّلْمُتَّقِيْنَ ۔

অর্থ : "এটা সেই কিতাব যাতে সন্দেহের লেশ মাত্র নেই আর এটি মুত্তাকিদের জন্য পথপ্রদর্শক।"

অনুরূপভাবে সূরা ইবরাহীম এ আলিক, লাম, রা এর পরেই আল্লাহ বলেছেন,

الٓرٰ ۔ كِتٰبٌ اَنْزَلْنٰهُ اِلَيْكَ لِتُخْرِجَ النَّاسَ مِنَ الظُّلُمٰتِ اِلَى النُّوْرِ۔

অর্থ : "এটা সেই কিতাব যা মানুষকে অন্ধকার থেকে আলোকের পথ দেখায়।"

এভাবে হয় তো বা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কোরআনের মহত্ব বর্ণনার উদ্দেশ্যেই আল্লাহ উদ্দেশ্য উক্তবর্ণগুলো ব্যবহার করেছেন। আল্লাহই ভালো জানেন।

কোরআন তিলাওয়াত ও পূণ্য অর্জন প্রসঙ্গ

প্রশ্ন : আমি রিয়াজ। আমার প্রশ্ন- কোরআনের প্রতিটি আয়াত পড়ার জন্য আমরা সওয়াব পাই। এখন কোরআনে তো 'ইবলিস' শব্দটিও আছে। সারাদিন আমি যদি 'ইবলিস' করি তবে কি সওয়াব পাব?

উত্তর : ভাই প্রশ্ন করেছেন যে, কোরআন তিলাওয়াত করলে আমরা সওয়াব পাই প্রতিটি বর্ণের বিনিময়েই, যা এসেছে তিরমিযী শরীরে ১০০৩ নং হাদিসে এসেছে তাহলে 'ইবলিস ইবলিস' যিকির করলে সওয়াব পাওয়া যাবে কি না? ভাই আমি আগেই বলেছি কোরআন ভালোভাবে বুঝে শুনে পড়তে হবে। আপনি যদি 'ইবলিস' শব্দটি বুঝে পড়েন যে, সে আমাদের শত্রু। সে আমাদের ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করে। ইবলিসের ধোঁকা থেকে বাঁচতে আল্লাহর আদেশ মানতে হবে ইত্যাদি। তবে আপনি অবশ্যই সওয়াব পাবেন।

প্রশ্ন ঃ আপনি বলেছেন অমুসলিমদেরকে আরবিসহ অনূদিত পবিত্র কোরআন উপহার দেওয়াই উত্তম। আবার এও বলেছেন, পকেট কোরআন নিয়ে ট্রেনে বা যানবাহনে কোরআন বিপড়ার কথা। আমার প্রশ্ন, এতে কোরআন পবিত্র অবস্থায় তিলাওয়াতের যে বিধান আছে তা কি অক্ষুন্ন থাকে? অমুসলিম কীভাবে পবিত্র হবে আর ট্রেনে বা বাসে কি সব সময় অযু থাকে?

উত্তর ঃ আপনি কোন অযুর কথা বলেছেন। আসলে ওযু ছাড়াও কোরআন তিলাওয়াতের অনেক উপায় রয়েছে। এ উদ্ধৃতিটি ফেরেশতাদের জন্য যা আমি আগেই ব্যাখ্যা করেছি। তবে এটা নিয়ে অনেক কথা আছে, আছে বিভিন্ন ব্যাখ্যা। একেক জন একেকভাবে ব্যাখ্যা করেছেন। এটা ফেরেশতাদের জন্য নাকি মানুষের জন্য এ নিয়ে যেমন বিতর্ক আছে, ভিন্ন ভিন্ন মত আছে, তেমনি কুরআন অযু ছাড়া স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়েও বেশ মতভেদ দেখা যায়। বিভিন্ন ইমাম, যেমন ইমাম আবু হানিফা, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম হাম্বলী, ইমাম মালেকীসহ বিভিন্ন মনীষী বিভিন্ন ভাবে তাদের মত দিয়েছেন। ইমাম আবু হানিফা (র) মনে করেন, বিনা ওযুতে কোরআন ছোঁয়া নিষিদ্ধ, তবে কাপড়ে পেঁচানো থাকলে বা কাপড়ের আবরণ থাকলে তা ধরতে কোনো অসুবিধা নেই।

ইমাম শাফেয়ী (র) বলেন, খালি দু মলাটই কাপড়ের কাজ করে। তাই আলাদা কাপড় না হলেও চলবে। যাহোক, অনেকের মতামত আবার একটু অন্য রকম। যেমন ইমাম হাম্বলী (র) মনে করেন, কোরআন অযু ছাড়া ধরতে কোনো সমস্যা নেই, তবে আরবি লিখিত অংশে হাত দেওয়া যাবে না। তবে ইমাম মালেক (র) বলেন, শিক্ষার্থীরা শিক্ষার জন্য ও শিক্ষকেরা শেখানোর উদ্দেশ্যে কোরআনের যে কোনো অংশই অযু ছাড়া স্পর্শ করতে পারবে। তাঁর মতে, এক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা রাখলে কোনো না কোনোভাবে তাদের শিক্ষা গ্রহণ ও দেওয়া দুটোতেই বাঁধার সৃষ্টি হতে পারে যা তাদের জন্য কোরআন ভুলে যাওয়ার পথ সৃষ্টি করতে পারে। তাই শিক্ষা দেওয়া ও গ্রহণ করার ব্যাপারে তিনি বেশ উদার।

এভাবে দেখা যায়, এ বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত রয়েছে তবে ইবনে হাজার আসকালানী, যিনি এ বিষয় নিয়ে অনেক আলোচনা করেছেন, তিনি মত দেন যে, পবিত্র কোরআন অযু ছাড়াও তিলাওয়াত করা যায় এতে অসুবিধা নেই। অযু ব্যতীত কোরআন স্পর্শ করা যাবে কিনা তা নিয়ে অনেক মতভেদ থাকলে একটি বিষয়ে সকলে একমত আর তাহলো অযসহ কোরআন তিলাওয়াত করাই সর্ব উত্তম। ইবনে হাজার কোরআনের অনেক উদ্ধৃতি ব্যাখ্যা, বিশ্লেষণ করে হাদিস থেকে বিভিন্ন উক্তি দিয়ে স্ববিস্তারে বর্ণনার পর যে সিদ্ধান্তে পৌঁছেছেন তা হলো, কোরআন তিলাওয়াত-এর ব্যাপারে কোনো পূর্বশর্ত নেই। এটা হাজার আসকালানীর মত। অন অনেকেও। তবে সাধারণভাবে হাদিসেও এসেছে 'ত্বাহারা' অর্থাৎ পবিত্রতা ছাড়া কোরআন স্পর্শ করা যাবে না।

কিন্তু 'ত্বাহারাত' বা পবিত্রতা বলতে কি অযু বুঝায়? বিষয়টি বিশ্লেষ করা দরকার। অযু করলেই কি একজন 'ত্বাহির' তথা পবিত্র হয়েছে বলা যায়? যদি কেউ আনুষ্ঠানিক বড় অপবিত্রতা তথা স্ত্রী সহবাসের পর অযু করে সে 'ত্বাহারাত' অর্জন করে না। তাই যে সকল হাদীসে পবিত্র কোরআন তিলাওয়াতের ব্যাপারে 'ত্বাহারা' তথা পবিত্রতার শর্ত আরোপ করা হয়েছে সে সকল হাদীসে মূলত বড় অপবিত্রতা থেকে পবিত্রতা অর্জনের কথা বলা হয়েছে। কেননা ঐ অবস্থায় অধিক সময় থাকা অনুচিৎ। এ ব্যাপারে মাওলানা সাইয়েদ আবুল আ্যা মওদুদী ও ইবনে আজিজসহ অনেকেই অনুরূপ মত প্রকাশ করেন। আর ইবনে হাজার আসকালানী বিস্তারিত বিশ্লেষণের পর এ সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, অযু ছাড়াও কোরআন তিলাওয়াত বৈধ। সুতরাং প্রয়োজনে তার ব্যাখ্যা দেখে নিতে পারেন। এবার অমুসলিমদের ব্যাপারে আসা যাক। আমার মনে হয় আমরা যদি মনে করি পবিত্র কোরআন অমুসলিমদের দেওয়া বৈধ, তবে তাঁর পক্ষে পবিত্র কোরআনের সূরা নাহল-এর ১২৫ নং আয়াতই যথেষ্ট। যেখানে আল্লাহ বলেছেন,

اُدْعُ اِلٰى سَبِيْلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ ـ

অর্থ : "মানুষকে ডাক আল্লাহর পথে হেকমতের সাথে।"

যদি আমি কোরআনই তাকে না দিই তবে কোন হেকমত? কৌশল অবলম্বন করবো? এছাড়া আল্লাহ্ সূরা বাকারা-এর ২৩ নং আয়াত ও সূরা বনী ইসরাঈল কাফেরদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়েছেন এভাবে,

وَاِنْ كُنْتُمْ فِىْ رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلٰى عَبْدِنَا فَاْتُوْا بِسُوْرَةٍ مِّنْ مِّثْلِهٖ ـ

অর্থ : "তারা যদি কোরআনকে মানব রচিত কোনো গ্রন্থ বলে ধরে নেয়, তবে একটি সূরা এমন কি আয়াতও তারা রচনা করে দিক।"

এই যে চ্যালেঞ্জ আল্লাহ কাফেরদের দিকে ছুঁড়ে দিয়েছেন এটা যদি তারা গ্রহণ করে তবে অবশ্যই তাদেরকে পবিত্র কোরআন পড়তে হবে। শুধু পড়তেই হবে না অত্যন্ত মনোযোগের সাথে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণসহ সব রকম কৌশলেই তাদের পড়তে হবে। আর যদি পড়তে হলে স্পর্শ করতে বা ধরতে হবেইবনা স্পর্শে তারা কিভাবে? তাহলে আল্লাহ্ যদি চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে কাফেরদের কোরআন স্পর্শ করার পথ খুলে দেন, তবে আমি আপনি নিষেধ করার কে?

আমরা কীভাবে তাদের কোরআন পড়ার ব্যাপারে বাদা দিব? এছাড়া আমি আগেও বলেছি, আল্লাহ যদি আমাকে অমুসলিমদের কোরআন দেওয়ার অভিযোগে অভিযুক্ত করেন তবে আমি নিশ্চিতভাবেই আমাদের প্রিয়নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- কে আমার পাশে পাব যেহেতু তিনি নিজেই কোরআনের আয়াত সম্বলিত পত্র তাঁর সরকার বিভিন্ন অমুসলিম রাজাদের কাছে লিখতেন। তাছাড়া একটু মনোযোগ দিয়ে কোরআনের হেদায়েত বিষয়ক আয়াতগুলো ব্যাখ্যাসহ বিস্তারিত পড়লে ও যৌক্তিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করে দেখলে এটা অতি সহজেই প্রতীয়মান হয় যে, অমুসলিমদের কোরআন দেওয়ার নিষেধাজ্ঞা থাকার কোনো কারণ কোনোভাবেই দাঁড় করানো যায় না।

প্রশ্ন : আমি আজকের এই বিশেষ আলোচনায় হাজির থাকতে পেরে নিজেকে সৌভাগ্যবান মনে করছি। আমি দোআ করি আল্লাহ যেন আমি ও অন্যান্য সকল শ্রোতাকে কোরআন সম্পর্কিত এ মূল্যবান আলোচনাটি হৃদয়ঙ্গম করার ও তার ওপর আমল করার তৌফিক দেন। যা হোক আমি আমার মূল প্রশ্নের দিকে সরাসরি যেতে চাই। আর তা হলো, অনেক অমুসলিম বলে থাকে, তোমাদের কাছে যে কোরআন আছে সেটি তো তোমাদের তৃতীয় খলিফা হযরত উসমান (রা) কর্তৃক সংকলিত। এটিতো আল্লাহ অবতীর্ণ মূল কোরআন নয়। এ অভিযোগটি কীভাবে খণ্ডানো যাবে?

কোরআন সংকলনের ইতিহাস প্রসঙ্গ

উত্তর : আপনি একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন করেছেন। অনেকেই এ অভিযোগ উত্থাপন করে থাকে যে, পবিত্র কোরআনের এ সংকলনটি হযরত উসমান (রা) থেকে এসেছে। আসলে যারা এটা বলে, তারা ভুল বলে। এটা বুঝার জন্য আপনারা দেখতে পাবেন ভিডিও ক্যাসেট 'ইজ দ্যা ওয়ার্ড অব গড।'

মূলত কথা হলো এটি মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এরই সংকলন। বিষয়টি ওভাবে ব্যাখ্যা করা যায়। যখন কোনো আয়াত নাযিল হত তখন মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাথে সাথে তা মুখস্থ করে

ফেলতেন। অনেক সাহাবী (রা) ও সেটা মুখস্থ করে ফেলতেন। তারপরও মহানবী (সা) সেই অংশগুলো নির্বাচিত কয়েকজন সাহাবী (রা)-এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্ন বস্তু যেমন তালের পাতা, পাতলা পাথর, তরবারির পাত ইত্যাদির ওপর লেখাতেন। পরে বিভিন্নভাবে সেগুলো পরখ করতেন। যদিও তিনি পড়তে জানতেন না তবুও একজনের লিখিত অংশ অন্যদের গিয়ে পড়িয়ে নিজে শুনতেন। এভাবে বিভিন্নভাবে যাচাই বাচাই করে কোরআনের বিশুদ্ধতা সম্পূর্ণ নিশ্চিত নিশ্চিত করতেন। এরপর মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ওফাতের ওফাতের পূর্ববর্তী রমজানে তিনি দু-দুবার কোরআন খতম করেন এবং সাহাবী (রা) তা শুনে আবার মিলিয়ে নেন।

এছাড়াও কোরআন বিক্ষিপ্তভাবে নাযিল হয়েছিল। এ পর্যায়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজে নতুন কোনো আয়াত কোন সূরায় কোন আয়াতের পরে যোগ হতে তা তিনি বলে দিলেন এবঙ এভাবে পবিত্র কোরআনের পরিপূর্ণ, স্বয়ংসম্পূর্ণ, পরিমার্জিত, পরিশীলিত ও সুসামঞ্জস্য পূর্ণ একটি সংকলন মহানবী নিজে করে দিয়ে গেলেন। আমরা এখন যেভাবে কোরআন সাজানো ও ধারাবাহিকভাবে সূরায় সূরায় বিন্যস্ত দেখতে পাই, এটিও কোনো সাহাবী (রা) বা খোলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তত্ত্বাবধায়নে সমাপ্ত। তাই এটিকে হযরত উসমান (রা) এর সংকলন বলার কোনো যৌক্তিকতা নেই। ব্যাপারটা হলো মহানবী (সা) কর্তৃক নির্দেশিত পন্থায় সাজানো ও বিন্যস্ত কোরআনের অনুলিপি কপি অনেকগুলো ছিল না। স্বল্প কয়েকটি মাত্র। কিন্তু সাহাবী (রা) যেহেতু মুখস্থ করে রেখেছিলেন, তাই কোনো প্রয়োজনও পড়ে শহীদ হলেন করেননি অনেক কপি করার। কিন্তু তখন ইমামার যুদ্ধে অনেক হাফেজ সাহাবী (রা) শাহাদাৎ বরণ তখন প্রয়োজন পড়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সুবিন্যস্ত কোরআনের কপি করা। এটিও অত্যন্ত সতর্কতার সাথে করা হয়। এমন কি সবচেয়ে প্রসিদ্ধ কোরআন নকলকারী সাহাবী জায়েদ বিন সাবিত-এর তত্ত্বাবধানে এ কাজটি সমাধান করা হয়।

এতে বুঝা যায় তাঁরা কোরআনের পরিশুদ্ধতার ব্যাপারে কতটাই আন্তরিক, সচেষ্ট ও কতর্ক ছিলেন। আসলে এগুলো ছিল নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নির্দেশিত সংকলনেরই অনুলিপি। নতুন কোনো সংকলন নয়। এর একটি কপি হযরত আবু বকর (রা) এর মৃত্যুর পর নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর পত্নী ও হযরত উমর ফারুক (রা)-এর মেয়ে হযরত হাফছা (রা)-এর সময় যে সমস্যাটি দেখা দিল তা হচ্ছে, ইসলামি খিলাফত ততদিনে অনেক বিশাল এলাকা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হযরত আবু বকর (রা) যে কয়েকটি কপি করেছিলেন তা ছিল সংখ্যায় বেশ। প্রত্যন্ত অঞ্চলে সে কপিগুলো পৌছানো অসম্ভব হয়ে যায়।

. এই ফাঁকে অন্যান্য সাহাবী (রা) যারা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানের বাইরে কোরআন লিপিবদ্ধ করেছিলেন তাদের অনেক কপিই বিভিন্ন স্থানে প্রচলিত হয়ে পড়ে। কিন্তু সমস্যা হলো যেগুলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর তত্ত্বাবধানের বাইরে লিপিবদ্ধ সেগুলো কোনোটি অসম্পূর্ণ ছিল কোনোটি ছিল অগোছালো অর্থাৎ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেভাবে আয়াতগুলো বিন্যস্ত করেছিলেন সেভাবে ছিল না। তবে এটি নিশ্চিত করার মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সংকলিত প্রতিলিপি বাদ রেখে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত ও বিভিন্ন অঞ্চলে প্রচলিত সকল পাণ্ডুলিপি পুড়িয়ে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম- এর তত্ত্বাধানে পরিসমাপ্ত কপিরই অনেকগুলো কপি করে পুরো মুসলিম বিশ্বে পাঠানো হয়। তাই সত্যি বলতে এটি হযরত উসমান (রা)-এর সংকলন বলাটা একদিন থেকে ভুলবরং এটি মহানবী সাল্লাল্লাহু

আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক সংকলিত। হযরত উসমান (রা) যা করেছেন তা হলো মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তত্ত্বাবধানের বাইরে বিক্ষিপ্তভাবে লিখিত অংশগুলো পুড়িয়ে ফেলে কোরআনের বিশুদ্ধতার পরিপূর্ণ রূপ দেন ও ভবিষ্যৎ ভুল হবার সকর পথ চিরতরে রুদ্ধ করে দেন।

আমি আগেও বলেছি যখন কোরআন নাযিল হতো উপস্থিত সকল সাহাবী তা লিখে রাখতেন। কিন্তু মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পক্ষে এর সবগুলো লেখা পরখ করে দেখা সম্ভব ছিল না। হযরত উসমান (রা) শুধু এই কপিগুলোই পুড়িয়ে ফেলেন। তাই যদি কেউ বলে অনেকগুলো সংকলন থেকে একটি রেখে বাকীগুলো পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে, তবে তা ভুল। কেননা কোরআনের সংকলন একটিই ছিল আর তা সংকলিত হয়েছিল স্বয়ং মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তত্ত্বাবধানে। হযরত উসমান (রা) শুধু সেটিকেই অবশিষ্ট রেখে বাকীগুলো পুড়িয়ে ফেলেন এবং সেটাকে কপি তাঁর খেলাফতের সকল এলাকায় প্রেরণের ব্যবস্থা করেন। অতএব আলহামদুলিল্লাহ আমাদের নিকট মহানবী (সা) কর্তৃক সংকলিত কোরআনই রয়েছে, অন্য কারো নয়। এরপর বর্তীতে শুধু মারওয়ান ও হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় অনারব মুসলিমদের পড়ার সুবিধার জন্য হরকত, তানভীন অর্থাৎ আমরা যাকে যের, যবর বলি এগুলো সংযোজন করা হয়েছে। এতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। কেননা যখন কোনো আরবীয় ব্যক্তি হরকত ছাড়া ও হরকতসহ কোরআন তিলাওয়াত করে তখন কোনো আরবীয় ব্যক্তি হরকত ছাড়া ও হকরতসহ কোরআন তিলাওয়াত করে তখন কোনো পার্থক্য থাকে না। তাই এটি বিশুদ্ধ, পরিশুদ্ধ ও মহানবী (সা) নির্দেশিত সংকলিত কোরআন এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

কোরআন বুঝে পড়া; ধারণাটি কী নতুন?

প্রশ্ন ঃ আমি অশোক কুমার। আমি তুলনামূলক বিজ্ঞান অধ্যয়ন করেছি। আমি একটি স্থানীয় পত্রিকায় কাজ করি। আমি অনুমতিক্রমে পবিত্র কোরআন ও বেদে উল্লিখিত কালিমা পাঠ করছি। এরপর আমার প্রশ্ন হচ্ছে– আপনি বলেছেন কোরআন পড়তে। অথচ এখন পর্যন্ত সারা পৃথিবীর মুসলমানরা কোরআন না বুঝেই পড়ছে। তাহলে আপনার কথা ভিত্তি কী? আমার দ্বিতীয় প্রশ্নটি হচ্ছে– এর পূর্বে আমাকে এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন যে, 'শাকাহারি' অর্থাৎ নিরামিভোজীরা ও মুসলমান থাকতে পারে, তাহলে ইসলামে পশু খাওয়া কেন হালাল করা হলো? এটা কি নৃশংসেতা নয়?

উত্তর ঃ ভাই বলেছেন, পবিত্র কোরআন এতোদিন ধরে মুসলমানরা না বুঝেই পড়ছে, তাহলে আমি কেন বোধগম্যতার সাথে পড়ার কথা বলছি? আসলেই কি তাই? আসলেই কি মুসলমানরা কোরআন না বুঝেই ১৪০০ বছর ধরে পড়ে আসছে? অবশ্যই না। মুসলামনরা যতদিন পর্যন্ত কোরআন বুঝে পড়ে এসেছে ততদিন পর্যন্ত ছিল তাদের স্বর্ণযুগ। ৬০০ সাল থেকে ১৩৫০ সাল পর্যন্ত ইউরোপের অন্ধকার যুগ। মুসলমানের সেই সময় ছিল নতুন স্বর্ণালি সভ্যতার নির্মাতা। বিজ্ঞানের নতুন নতুন শাখায় তারা ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা ও লালনকারী। তারা তখন কোরআন বুঝে পড়তেন, কোরআনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করেছিলেন বলেই তারা এতোটা আধুনিক ও বিজ্ঞানমনস্ক জাতিতে পরিণত হতে পেরেছিলেন।

কিন্তু আস্তে আস্তে যখন কোরআনের সাথে মুসলমানদের সম্পর্ক ছিন্ন হতে লাগলো কোরআন থেকে সরতে থাকল তখনই তাদের বিচ্যুতি ঘটলো। তারা উন্নয়ন হতে পিছিয়ে পড়লে। কেননা তারা সত্য ধর্ম ইসলাম ও সত্য গ্রন্থ কোরআন থেকে বিচ্যুত হলো। অনুরূপভাবে অমুসলিমরা উন্নত হতে লাগলো। কারণ তারা তাদের মিথ্যা ধর্ম অনুসরণ করা বাদ দিয়ে কোরআন বিশ্লেষণে মমদিল। তাই মুসলমানরা যদি আবার কোরআন বোধগম্যতার সাথে পড়া শুরু করে তবে অবশ্যই তারা উন্নত হতে পারবে।

ইসলামে ও জীব সংহার করে খাওয়ার অনুদিত দান

আপনার ২য় প্রশ্নের জবাবে বলবো, কাউকে মুসলিম হতে হলে আল্লাহর ওপর পূর্ণ আস্থা ও বিশ্বাস থাকতে হবে। আল্লাহর আদেশ নিষেধ মেনে চলা, মুসলমান হওয়ার শর্ত। তাই কেউ বলতে পারে 'আমি ডাক্তার না হয়েও মুসলমান। আমি ইঞ্জিনিয়ার না হয়েও মুসলমান'। কেননা মুসলমান হতে হলে এগুলো হওয়া শর্ত নয়। অনুরূপভাবে কেউ নিরামিষভোজী হয়েও কিংবা না হয়েও মুসলমান হতে কোনো বাঁধা নেই। তবে এটা তাকে মানতে হবে যে, আল্লাহ্ যা আমাদের জন্য হালাল করেছেন তা খাওয়া কখনোই অন্যায় নয়। এখন তিনি সেটা না খেলে কার কি করার আছে?

আসল কথা হচ্ছে খাওয়ার বৈধতার ব্যাপারে আল্লাহ্ নীতিমালা দিয়ে দিয়েছেন। যেমন সূরা মায়েদার ৫নং আয়াতে আল্লাহ্ বলেন,

أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبٰتُ.

অর্থ: "তোমাদের জন্য পবিত্র বস্তু হালাল করা হয়েছে।"

এখানে আল্লাহ্ চতুষ্পদ জন্তু হালাল করেছেন। আবার সূরা মুমিনুন- এর ২১ নং আয়াতেও আল্লাহ্ বলেন,

وَإِنَّ لَكُمْ فِي الْأَنْعَامِ لَعِبْرَةً. نُسْقِيكُمْ مِمَّا فِي بُطُونِهَا وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ كَثِيرَةٌ وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ.

অর্থ: "তোমাদের জন্য চতুষ্পদ জন্তুদের মধ্যে চিন্তার বিষয় আছে। আমি তোমাদের তাদের উদরস্থিত বস্তু থেকে পান করাই এবং তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে আছ অনেক উপকারিতা। তোমরা তাদের থেকে ভক্ষণ কর।"

এখন আপনি বলতে চাচ্ছেন মানুষ প্রাণী হয়ে অন্য প্রাণীর গোশত খাবে এটা কতটুকু বাস্তব সম্মত? দেখুন ভাই, লক্ষ করবেন যে সকল প্রাণী মাংশাসী তাদের দাঁদগুলো তীক্ষ্ণ ও ধারালো। আবার যে সকল প্রাণী তৃণভোজী যেমন– গরু, ছাগল, ভেড়া এদের দাঁত চ্যাপ্টা। আপনি যদি নিজে আয়নার সামনে গিয়ে দাঁড়ান তবে দেখতে পাবেন মানুষের তীক্ষ্ণ, ধারালো, আবার চ্যাপ্টা দু ধরনের দাঁতই আছে। কেন এমনটা? কারণ, মানুষ এমন প্রাণী যা আমিষ ও নিরামিষ তথা গোশত ও শাক-সব্জি দুটোই খায়। মানুষকে যেহেতু এভাবে সৃষ্টিই করা হয় তবে খেতে বাঁধা কোথায়? আবার পরিপাকতন্ত্রের দিকে খেয়াল করুন। তৃণভোজী প্রাণীদের পরিপাকতন্ত্র একভাবে তৈরি। তারা আমিষ তথা গোশত খেয়ে হজম করতে পারে না। বিপরীতক্রমে আমিষাসী প্রাণী তথা গোশতভোগী প্রাণী লতা, পাতা হজম করতে পারে না। অথচ মানুষের পরিপাকতন্ত্র এমনভাবে তৈরি করে যে তা আমিষ ও নিরামিষ উভয়টিই হজম করতে পারে। এতেই কি বুঝা যায় না মানুষ আমীষ ও নিরামিষ দুটোই খাবে?

আপনি এখন বলবেন মানুষ রান্না করে খায় বলেই হজম হয়। আচ্ছা কোনো ছাগল বা গরুকে গোসত রান্না করে খাওয়ান তো দেখি হজম করতে পারি কি না। ইউরোপে একবার গরুকে বিশেষ প্রক্রিয়ায় আমিষ খাওয়ানো হলে ম্যাড কাউ রোগের প্রাদুর্ভাব হয়েছিল। এতেই বুঝা যায় যে প্রাণীর যা দরকার সেভাবেই আল্লাহ্ সেই প্রাণীকে সৃষ্টি করেন। অতএব আমিষ খাওয়াতে মানুষের কোনো অপরাধ নেই। আপনি যে যুক্তিতে আমিষ

খাওয়ার বিরোধিতা করছেন তা হলো যে প্রাণী জবাই করা হলে তার কষ্ট হয়। এখন কথা হচ্ছে মানুষ তাহলে কী খাবে? বিজ্ঞান আজ প্রমাণ করেছে 'গাছেরও প্রাণ আছে' অনুভূতি আছে। তারা ব্যাথা পায়, এমন কি আনন্দিতও হয়। তাহলে কি মানুষ শাকসবজি খাওয়াও বন্ধ করে দেবে? এটা যেহেতু অসম্ভব তাই আমিষ ও নিরামিষ খেতে বাধা কোথায়-যে ক্ষেত্রে খাওয়া ও না খাওয়ার দুটোর ক্ষেত্রেই এক।

হ্যাঁ, আপনি এখন বলছেন, গাছের অনুভূতি শক্তি কম তাই তো খাওয়া যাবে। আচ্ছা আপনার কথা না হয় মেনেই নিলাম। মনে করুন, আপনার এক ভাই বোবা ও অন্ধ অর্থাৎ অনুভূতি শক্তি কম। এখন কেউ তাকে খুন করলো। আপনি আদালতে বলবেন, 'মহামান্য আদালত, আমার ভাইয়ের অনুভূতি শক্তি কম ছিল তাই খুনির শাস্তি কম হোক।' অবশ্যই তা বলবেন না। আসলে অনুভূতি শক্তি কম বা বেশি ও যুক্তিতে নিরামিষ খাওয়া বৈধ আর আমিষ খাওয়া অবৈধ এটা কখনোই যুক্তি হতে পারে না। প্রিয় আশেষক ভাই, আপনি এখানে আরো আসুন এবং প্রশ্ন করুন তাতে আমার কোন আপত্তি নেই। তবে কথা হচ্ছে, এটা প্রশ্নোত্তর পর্ব। এখানে প্রশ্ন করার মত অনেকেই, তাদেরও সুযোগ দিন। এ বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিক যুক্তি প্রমাণসহ দুই-তিন ঘন্টার আলোচনাও করা যাবে। কিন্তু এমন সময় কোথায়? আশা করি এর মধ্যেই উত্তর পেয়েছেন ধন্যবাদ।

একটি অমূলক অভিযোগ এবং তা খণ্ডন

প্রশ্ন ঃ যদি কোনো অমুসলিম বলে যে, কোরআন শয়তান রচিত বা শয়তান এটির বাহক যা সে বহন করার সময় ইচ্ছে মত পরিবর্তন করেছে তখন আমরা কী বলে এ অভিযোগ খণ্ডন করতে পারি?

উত্তর ঃ বোন আপনি আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ অভিযোগ অবতারণা করেছেন যা কিনা অমুসলিমদের মাধ্যমে অনেক সময় উত্থাপিত হয়। আমার মনে হয় একবার প্রত্যুত্তরে এতোটুকু বলাই যথেষ্ট যে, যদি কোরআন শয়তান পরিবর্তন করত হবে কেন সূরা নাহ্‌ল এর ৯৮ নং আয়াত হলো উল্লেখ আছে,

فَاسْتَعِذْ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطٰنِ الرَّجِيْمِ ـ

অর্থ ঃ "বল, আমি বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান হতে মুক্তি চাই।"

শয়তান কেন তাকে বিতাড়িত ও অভিশপ্ত শয়তান বলবে? কেন সে তার বাণীর মাধ্যমে সকলকে তার থেকে দূরে থাকার, মুক্ত থাকার দোআ শেখাবে? অতএব এটা দিবালোকের মত পরিষ্কার যে, এটা কখনো শয়তানের পক্ষ থেকে হতে পারে না। বস্তুত পুরো কুরআন জুড়েই মানুষকে সে সব পথের দিকে যাবার নির্দেশনা রয়েছে যা থেকে শয়তান মানুষকে ফিরিয়ে রাখতে চায়। বিপরীত ক্রমে শয়তান মানুষকে দিয়ে যা করাতে চায় কোরআনের অবস্থান তার থেকে সবসময় বিপরীতমুখী। আর শয়তানের সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহ। অথচ পবিত্র কোরআনের বহু স্থানে আল্লাহর গুণগান ও গুণবাচক নাম রয়েছে। উপরন্তু সূরা আরাফের ২০০ নং আয়াতে বলা হয়েছে,

وَاِمَّا يَنْزَ غَنَّكَ مِنَ الشَّيْطٰنِ نَزْغٌ فَا سْتَعِذْ بِاللّٰهِ ـ

অর্থ ঃ "যখনই শয়তান তোমাদের কুমন্ত্রণা দেয় তখনই আল্লাহর দরবারে সাহায্য চাইবে।"

লক্ষণীয়, এখানে শয়তানকে প্ররোচনাকারী হিসেবে উল্লেখ করা হয়েছে। শয়তান কেন নিজেকে প্ররোচনা দানকারী বলবে ও তাঁর খপ্পর থেকে মানুষকে বাচার জন্য তার সবচেয়ে বড় শত্রু আল্লাহর কাছে আশ্রয় চাওয়ার কথা বলবে। নিজের রচিত গ্রন্থে কে এমন বলে? আবার যারা বলে, কোরআন শয়তান বহন করার সময় ইচ্ছে

করে পরিবর্তন করেছে তাদের জন্য সূরা ওয়াকিয়াহ-এর ৭৭-৭৯ নং আয়াতগুলোই যথেষ্ট। এ আয়াতগুলো আগেও বলেছি,

اِنَّهٗ لَقُرْاٰنٌ كَرِيْمٌ ـ فِىْ كِتٰبٍ مَّكْنُوْنٍ ـ لَا يَمَسُّهٗٓ اِلَّا الْمُطَهَّرُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "নিশ্চয় এটি সম্মানিত কোরআন আছে যা সংরক্ষিত পবিত্র লওহে মাহফুজে, যেখানে অপবিত্র অবস্থায় কেউ ছুঁতেও পারে না।"

এ আয়াতগুলো অবশ্য কাফেরদের এমন ধরনের নানা অভিযোগের প্রেক্ষিতেই নাযিল হয়েছিল যা অনেকেই কোরআন স্পর্শ করার শর্ত হিসেবে ওযু করার নির্দেশ হিসেবে দাঁড় করেন। কিন্তু এখানে লওহে মাহফুজ সম্পর্কে বলা হয়েছে এটা এমন সংরক্ষিত স্থান যেখানে কোনো অপবিত্র কিছুই প্রবেশ করতে পারবে না। শয়তান অপবিত্র ফলে তার সেখানে প্রবেশ কখনোই অসম্ভব নয়। তাই কোরআনের পরিবর্তন শয়তানের পক্ষে সম্পূর্ণভাবেই অসম্ভব। কোরআন নাযিলে শয়তানের যে কোনো ধরনের সংশ্রব নেই তা সূরা শূয়ারা-এর আয়াত ২১০-২১২ নং আয়াত পড়লেও বুঝা যায়। সেখানে বলা হচ্ছে,

وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيٰطِيْنُ ـ وَمَا يَنْۢبَغِىْ لَهُمْ وَمَا يَسْتَطِيْعُوْنَ ـ

অর্থ ঃ "এই কোরআন শয়তান অবতীর্ণ করেনি। তারা এ কাজের যোগ্যও নয় এবং ক্ষমতাও রাখে না। তাদেরকে শ্রবণের জায়গা হতেও অনেক দূরে রাখা হয়েছে।"

প্রশ্ন ঃ আসসালামু আলাইকুম আমি আলহাজ্জ আমীর, আমার এটি কি ঠিক যে, কেউ মারা গেলে কোরআনখানী করতে হবে বা এতে কি কোনো লাভ আছে?

উত্তর ঃ প্রশ্নটা করা হয়েছে যে কোনো অনুষ্ঠানের শুরুতে বা কারো মৃত্যুতে দল বেঁধে কোরআনখানী করা কতটুকু সঠিক। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কোরআন কি একজন্য নাযিল হয়েছে যে, মানুষ সেটি দল বেঁধে খতম করবে? কোরআন কি এজন্য অবতীর্ণ, হয়েছে, কেউ শুধু কেউ মারা গেলে এটা পড়লেই চলবে? নাকি কোরআন এজন্য নাযিল যে মানুষ সেটি ভালোভাবে বুঝে পড়বে, সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝবে ও সে অনুযায়ী মৃত্যুতে বা তাঁর জানাযায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এভাবে দল বেঁধে সবাইকে নিয়ে কোরআন খতম করেছেন। যদিও তাঁরা আরবি ভাষী এবং তিলাওয়াতই তাঁদের বুঝার জন্য যথেষ্ট। তাই আমার মত হচ্ছে, ঠিক আছে যদি কোরআন খতমের একান্তই ইচ্ছে হয় তবে ৩০ জন লোক না নিয়োগ করে ৬০ জনকে বললেই হয় যেন তাঁরা শুধু তেলাওয়াত না করে প্রত্যেকে আধা পারা অর্থসহ বুঝে পড়ুক। অথবা ধীরে সুস্থে এক ঘণ্টার পরিবর্তে দু ঘণ্টা ধরে অর্থসহ ভালোকরে বুঝে শুনে তিলাওয়াত করুন। তাতেই কি কোরআন নাযিলের উদ্দেশ্য বেশি করে সফল হয় না? আমার মনে হয় আপনারা আমার কথা বুঝতে পেরেছেন।

কোরআনের রহিত আয়াত প্রসঙ্গ -

প্রশ্ন ঃ আলোচনার এ পর্যায়ে আমার মনে একটি প্রশ্ন জেগেছে। সেটি যে সমস্ত মুসলমান কোরআনের 'সংক্ষেপক' তত্ত্বে বিশ্বাস করেন সে বিষয়ে। আমরা জানি পবিত্র কোরআনে এমন কিছু আয়াত রয়েছে যেগুলো পরবর্তী সময়ে অন্য আয়াত নাযিল হওয়ায় রহিত হয়ে গেছে। তারা বলে যে, আল্লাহ প্রথমে ভুলবশত সে আয়াতগুলো নাযিল করেছিলেন পরে অন্য আয়াত নাযিল করে তা সংশোধন করেছেন। প্রশ্ন হচ্ছে আসলেই প্রথমে আল্লাহ ভুল করে পরে শুদ্ধ করেছেন কিনা?

উত্তর : পবিত্র কোরআনে এমন অনেক আয়াত আছে যেগুলো অন্য আয়াত নাযিল হওয়ার পর রহিত হয়ে গেছে। বোনের প্রশ্ন এটি আল্লাহ্ ভুল করে করেছেন কিনা? আল্লাহ্ সূরা বাকারাহ্-এর আয়াত ১০৬ এ উল্লেখ করেছেন,

مَا نَنْسَخْ مِنْ اٰيَةٍ اَوْ نُنْسِهَا نَاْتِ بِخَيْرٍ مِّنْهَا اَوْ مِثْلِهَا ۔ اَلَمْ تَعْلَمْ اَنَّ اللّٰهَ عَلٰى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ ۔

অর্থ : "আমি কোনো আয়াত রহিত করলে তার চেয়ে উত্তম আয়াত বা সমপর্যায়ের আয়াত নাযিল করি। আল্লাহ সবকিছুর ওপর শক্তিমান।"

একইভাবে সূরা নাহ্লের ১০১ নং আয়াতে বর্ণনা করা হয়েছে, وَاِذَا بَدَّلْنَا اٰيَةً مَّكَانَ اٰيَةٍ ۔

অর্থ : "আল্লাহ্ কখনো আয়াত রহিত করে না। তবে প্রতিস্থাপন করেন এর থেকে উত্তম বা সমমান আয়াত দিয়ে।"

এ আয়াতে আরবি শব্দ যার অর্থ 'প্রতিস্থাপন' বা 'কোরআনের বাক্য'। যদি আমরা 'প্রতিস্থাপন' অর্থ মেনে নিই, তবে বলতে পারি পূর্ববর্তী সকল আসমানি কিতাব যেমন তৌরাত, যবুর, ইনজিল ইত্যাদিকে প্রতিস্থাপন করা হয়েছে কোরআনের মাধ্যমে। অর্থাৎ ঐ কিতাবগুলোর পরিবর্তে এখন কোরআন অনুশীলন করতে হবে, এটিও এগুলোর চেয়ে উত্তম। আবার আয়াতের অর্থ যদি 'পবিত্র' কোরআনের বাক্য

গ্রহণ করা হয় তখন উপরোল্লিখিত আয়াত দুটোর ভাবার্থ দাঁড়ায় যে, আল্লাহ্ কোরআনের কিছু বাক্য স্থগিত করে তার সমানের বা তার চেয়ে উত্তম বাক্য নাযিল করেন। এর অর্থ এটা নয় যে, আয়াতগুলো পূর্বে হয়েছিল সেগুলোর আর প্রয়োজন নেই বা সেগুলো পরস্পর বিরোধী ভুল ছিল অনেক মুসলিমই দ্বিতীয় ব্যাখ্যাটি গ্রহণ করেন। অর্থাৎ তারা মনে করেন কোরআনের কিছু বাক্য অন্য বাক্য দ্বারা রহিত হয়ে গেছে।

তারা মনে করেন, যেগুলো রহিত হয়ে গেছে সেগুলো অপ্রয়োজনীয় ও তা মানা উচিত। নয়। তাদের মত এই যে, একই বিষয়ে কয়েকটি আয়াত নাযিল হলে শুধু মাত্র শেষের আয়াতটি মানা উচিত, আগেরগুলো নয়। তারা অনুভব করেন সেগুলো সংঘটিত ও প্রথম আয়াতগুলো অপ্রয়োজনীয়। এ নিয়ে বেশ ভুল বোঝাবুঝি আছে। আসলে অনেক সময় দেখা যায় যে, পরবর্তীতে নাযিল কৃত আয়াত পূর্বের চেয়ে অধিক তথ্য সমৃদ্ধ। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, আগে নাযিলকৃত আয়াতের সাথে অসঙ্গতিপূর্ণ বা সাংঘর্ষিক। বরং বলা যায়, অতিরিক্ত তথ্যপূর্ণ। একটা উদাহরণ দেওয়া যাক। আপনাদের হয়তো মনে আছে আমি উল্লেখ করেছি কোরআনের একটি চ্যালেঞ্জের কথা। আল্লাহ্ অমুসলিমদের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে সূরা ইসরা ৮৮ নং আয়াতে বলেন,

قُلْ لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الْاِنْسُ وَالْجِنُّ عَلٰٓى اَنْ يَّاْتُوْا بِمِثْلِ هٰذَا الْقُرْاٰنِ لَا يَاْتُوْنَ بِمِثْلِهٖ ۔

অর্থ : "পৃথিবীর সমস্ত মানুষ এবং জ্বীন সম্প্রদায় একত্রিত হয়েও কোরআনের মতো একখানা গ্রন্থ রচনা করতে পারবে না।"

এরপর সূরা তুর০এর ৩৪ নং আয়াতে চ্যালেঞ্জ সহজ করে দেওয়া হয়েছে। এটিও যখন অমুসলিমরা করতে ব্যর্থ হয় তখন সূরা হুদ-এর ১৩ নং আয়াতে আল্লাহ চ্যালেঞ্জ ছোট করে অধিকতর সহজ করে দশটি সূরা রচনার সামর্থকে চ্যালেঞ্জ হিসেবে ছুঁড়ে দেন। যখন এটি মোকাবেলা করতেও সমস্ত কাফির সম্প্রদায় পুরোপুরি ব্যর্থ হয় তখন আল্লাহ্ চ্যালেঞ্জ আরো সহজ করেন। সূরা ইউনুস -এর ৩৮ নং আয়াতের মাধ্যমে অধিকতর সহজ করে দেন। এবার তিনি দশটি নয় বরং একটি সূরা রচনা করার সামর্থকে কাফেরদের প্রতি চ্যালেঞ্জ হিসেবে দেন।

দেখা যায় সত্যি সত্যি তারা এ চ্যালেঞ্জটি গ্রহণ করতেও সম্পূর্ণরূপে অপরারগ ও অকৃতকার্য হয়। তখন মহান আল্লাহ সূরা বাকারাহ্-এর ২৩-২৪ নং আয়াতের মাধ্যমে চ্যালেঞ্জকে সবচেয়ে সহজ করে দেন। এবার তিনি কোরআনের ছোট একটি সূরা বা আয়াত রচনার ক্ষমতা নিয়েও অমুসলিমদের ব্যর্থতা ও অক্ষমতা তুলে ধরেন এবঙ এটি যে মানবরচিত নয় তা আবারো নিশ্চিত করেন।

তিনি কাফেরদের ভুল প্রমাণিত করতে চ্যালেঞ্জকে পর্যায়ক্রমে সহজ থেকে সহজতর করে মূলত তার বক্তব্যের যথার্থতা প্রমাণ ও মানুষের অক্ষমতাকে চোখে আঙ্গুল দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। এরই সাথে কোরআন যে সম্পূর্ণ রূপেই ঐশীগ্রন্থ সেটি শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এখন যদি কেউ বলে সূরা ইসরা আয়াত ৮৮ নং আয়াতে কোরএনর যে মত দেওয়া হয়েছিল তার কোনো প্রয়োজন নেই যেহেতু সূরা বাকারায় সর্বশেষে মাত্র একটি সূরা বা আয়াত রচনার সামর্থ্যকে চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছে। এ ছোট চ্যালেঞ্জই যদি যথেষ্ট তবে এতো বড় চ্যালেঞ্জ দেওয়ার প্রয়োজন কী? অতএব চ্যালেঞ্জ সম্পর্কিত পূর্বের আয়াতগুলো অপ্রয়োজনীয় এবং এটির সাথে সাংঘর্ষিক।

যারা এভাবনাটি ভেবে থাকেন তারা আসলে কোরআনের ক্ষেত্রে সঠিক নয়। যদি আমি কাউকে প্রথমে বলি যে এস. এস. সি পার হতে পারবে না। তারপরে যদি তার বোকামি ধরা পড়ে, আবার বলি সে অষ্টম শ্রেণীও পার হতে পারবে না। এর অর্থ এই নয় যে, প্রথম চ্যালেঞ্জটি অপ্রয়োজনীয় ছিল এর তা দ্বিতীয়টির সাথে সাংঘর্ষিক। কেননা ২য় চ্যাঙ্গেঞ্জ অষ্টম শ্রেণী পার না হওয়ার চ্যালেঞ্জ দ্বারা এটি বোঝায় না যে, সে দশম শ্রেণী পাশ করতে পারবে। বরং পূর্বেরটিকে আরো শক্ত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করে। তাই আগের চ্যালেঞ্জটি অপ্রয়োজনীয় বা সাংঘর্ষিক কোনোটিই নয়।

উপরন্তু এভাবে পর্যায়ক্রমে যদি ছোটতর চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দেওয়া যায় যে, পঞ্চম শ্রেণী, প্রথম শ্রেণী এবং সর্বশেষ নার্সারিও পাশ করতে পারবে না, তবে আগের কোনো চ্যালেঞ্জই মিথ্যা প্রতিপন্ন হয় না বা ভুল প্রমাণিত হয় না। বরং প্রথমেই নার্সারি পাশের চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিলে লোকটার অক্ষমতা যতটা প্রমাণিত হয়। এভাবে ধাপে ধাপে চ্যালেঞ্জ করার বক্তব্য তার চেয়ে অনেক বেশি সুকঠিন ভিত্তির উপর স্থান পায়। আল্লাহ সেটিই করেছেন এভাবে বার বার চ্যালেঞ্জকে সহজতর করে। তাই যারা পূর্বের চ্যালেঞ্জগুলো নিষ্প্রয়োজনে মনে করেন তারা বুঝতে ভুল করেন। সমস্যা তাদের বোধগম্যতার। আরেকটি উদাহরণ দিচ্ছি, আল্লাহ তাআলা মাদকদ্রব্য সম্পর্কে কোরআনে বিভিন্ন স্থানে বিভিন্নভাবে আদেশ দিয়েছেন।

যেমন সূরা বাকারাহ-এর ২১৯ নং আয়াতে বলেন–

يَسْئَلُوْنَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ ـ قُلْ فِيْهِمَا اِثْمٌ كَبِيْرٌ وَّمَنَا فِعُ لِلنَّاسِ ـ

অর্থঃ "তারা আপনাকে মাদকদ্রব্য সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। আপনি বলে দিন এতে কিছু উপকার আছে, তবে ক্ষতির পরিমাণ বেশি।"

এরপর সূরা নিসা-এর ৪৩ নং আয়াতে আল্লাহ ঘোষণা দেন,

يَاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا لَاتَقْرَبُوا الصَّلٰوةَ وَاَنْتُمْ سُكٰرٰى ـ

অর্থঃ "হে ঈমানদারগণ তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযে দাঁড়িয়ো না।

এভাবে আল্লাহ প্রথমে মদ সম্পর্কে নিরুৎসাহিত করে পরে সীমিত আকারে সেটি নিষিদ্ধ করেন। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, প্রথমে মদ সম্পর্কে যে সামান্য উপকারিতার কথা বলা হয়েছে, তা বাতিল হয়ে গেছে। না সেটাও

সত্য, কিন্তু সালাতে সেটা অগ্রহণযোগ্য বলে নির্দেশ দেওয়া হয়। আসলে ঐ সময় আরবে মাদক ও জয়ার এতো ব্যাপক প্রচলন ছিল যে, হঠাৎ সেটা বন্ধ করা সামাজিক অস্থিরতা সৃষ্টি করতে পারতো। এজন্যই ধাপে ধাপে নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু তাই বলে এটি অন্যটির সাথে সাংঘর্ষিক তা নয়। শেষ পর্যন্ত সূরা মায়েদা ৯০ নং আাতে মদ্রকদ্রব্য পুরোপুরি নিষিদ্ধ করা হয়। কিন্তু লক্ষ্য করুন, কোনোটার সাথেই কোনোটি সাংঘর্ষিক হয়নি।

যদি আল্লাহ বলতেন, নামাযের সময় মাদকগ্রহণ করা যাবে না কিন্তু অন্য সময় গ্রহণ করা যাবে তাহলে সাংঘর্ষিক হতো। কিন্তু আল্লাহ নেশাগ্রস্ত অবস্থায় নামায নিষিদ্ধ করেছেন। কারণ তিনি জানতেন তিনি আসেলে শেষ পর্যন্ত কোন আদেশ দেবেন। এজন্যই কোরআনের আয়াতগুলোর মধ্যে কোনো সাংঘর্ষিক অবস্থা থাকে না। মনে করুন, আমি কোনো বন্ধুকে বললাম, নিউ ইয়র্ককে যেও না। তারপর বললাম ইউ. এস. এ যেও না। এরপর সর্বশেষ বললাম, আমেরিকা মহাদেশেই যেও না, তবে আমার কোনো কথাই সাংঘর্ষিক নয়, কেননা আমি যখন আমেরিকা মহাদেশে যেতে নিষেধ করি তার মধ্যে ইউ. এস. এ এবং নিউ ইয়র্ক দুটোই চলে আসে। তাই আগের দুটো আদেশও বলবৎ থাকে। কোনোটাই বাতিল হয় না। এভাবেই দেখা যায় কোরআনের আয়াতগুলোও সাংঘর্ষিক হয় না। আল্লাহ্ সূরা নিসা-এর ৮২ নং আয়াতে বলেন,

أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِنْدِ غَيْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِيهِ اخْتِلَافًا كَثِيرًا

অর্থ ঃ "তারা কি মনে করে কোরআন অন্য কারো কথা? তাই যদি হতো তবে কোরআনে এখতেলাফ তথা একই বিষয় নিয়ে সাংঘর্ষিক তথ্য থাকতো।"

কোরআনে এমন সাংঘর্ষিক আয়াত নেই বরং অতিরিক্ত তথ্য সমৃদ্ধ আয়াত থাকতে পারে। আশা করি সবাই বুঝেছেন।

ইসলামি ঐক্য ও কোরআন

প্রশ্ন ঃ জাকির ভাই, বলবেন কি একই কোরআন থাকা সত্ত্বেও মুসলমানদের মধ্যে এমন বিভেদ কেন?

উত্তর ঃ আমার ভাই প্রশ্ন করেছেন আমরা সকল মুসলিম এক কোরআন অনুসরণ করলেও কেন এতো মতপার্থক্য আমাদের মধ্যে। আল হামদুলিল্লাহ আমাদের সকল সমস্যার সর্বোত্তম সমাধান কোরআনেই আছে। তাই আমরা ঐক্যবদ্ধ থাকবো এমনটিই কথা ছিল। মহান আল্লাহ্ তাআলা সূরা আলে ইমরান-এর ১০৩ নং আয়াতে নির্দেশ দিয়েছেন,

وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا ـ

অর্থ ঃ "তোমরা আল্লাহর রজ্জুকে সম্মিলিতভাবে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর।"

এখানে 'রজ্জু' বলতে কোরআনকে বুঝানো হয়েছে। তাই কোরআন সকলে সম্মিলিতভাবে পালন করবে– এটাই হলো আল্লাহর হুকুম। আল্লাহ পবিত্র কোরআনের সূরা আনআম-এর ১৯ নং আয়াতে আরো নির্দেশ দেন,

অর্থ "বল সাক্ষ্য হিসেবে কোন জিনিস সর্বশ্রেষ্ঠ? তুমি বল, তোমার ও আমার মধ্যে আল্লাহই শ্রেষ্ঠ।"

কিন্তু আমরা কাউকে যদি প্রশ্ন করি 'তুমি কে', সে বলে, 'আমি শিয়া, সুন্নী, হানাফী, শাফেয়ী, হাম্বলী, মালেকী ইত্যাদি। অথচ আল্লাহর নির্দেশ নিজেকে 'মুসলিম' বলে পরিচয় দিতে। আপনি যদি হানাফী বা হাম্বলী শতাবলী

হন, আপনার মনে প্রশ্ন জাগে না মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ও সাহাবী (রা) কী ছিলেন? তিনি কি হানাফী না কি হাম্বলী? তিনি যদি কোনোটাই না হোন, তবে আপনি কেন? অথচ আল্লাহ বলেছেন, আমরা সবাই মুসলিম।' আল্লাহ সূরা আলে ইমরান-এর ৬৭ নং আয়াতে বলেন,

مَا كَانَ اِبْرٰهِيْمُ يَهُوْدِيًّا وَّلَا نَصْرَانِيًّا وَّلٰكِنْ كَانَ حَنِيْفًا مُّسْلِمًا ـ

"ইবরাহীম (আ) না ছিলেন ইহুদিম না ছিলেন খ্রিষ্টান, তিনি ছিলেন মুসলমান।"

এভাবে মহান আল্লাহ আমাদের সকলের পরিচয় দিয়েছেন 'মুসলিম' হিসেবে। অথচ আমরা নিজেরা হানাফী, শাফেয়ী, মালেকী, হাম্বলী, শিয়া, সুন্নী কত রকম পরিচয় তৈরি করে নিয়েছি।

আমি কোনো মুসলিম দার্শনিক বা চিন্তাবিদকে ছোট করছি না। আবু হানিয়া, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম মালেকী, ইমাম হাম্বলী, সকলের ওপর আল্লাহ্‌র শান্তি বর্ষিত হোক। তাঁরা সকলেই ইসলামের বড় বড় দার্শনিক পণ্ডিত ও খেদমতগার ছিলেন। তাঁদের এই ইলম, ত্যাগ সবকিছুর জন্যই ইনশাল্লাহ আল্লাহ্ অনেক মর্যাদাপূর্ণ প্রতিদান দেবেন। তাই বলে আমরা কেন আমাদের মুসলিম হিসেবে পরিচয় না দিয়ে তাদের নামে দেবো? আমরা কেন বলবো, 'আমি হানাফী, আমি হাম্বলী ইত্যাদি ইত্যাদি।' অথচ আল্লাহ সূরা আলে ইমরান-এর আয়াত ৬৪ এ বলেছেন,

"বলো, আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি আমি মুসলিম।"

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন। (আবু দাউদ হাদীস নং- ৪৫৭৯)

"আমার উম্মত ৭৩ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাবে।"

এই যে কথা, এখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেননি 'তোমরা ৭০ ভাগে বিভক্ত হয়ে যাও।' বরং বলেছেন যে, বিভিন্ন ধারায় বিভক্ত হয়ে যাবে। অথচ আল্লাহ বলেছেন, আল্লাহর রজ্জু তথা কোরআন সম্মিলিতভাবে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরতে।

আসল কথা হচ্ছে, আপনি যে কোনো মুসলিম দার্শনিকের যে কোনো মতামত ততটুকুই গ্রহণ করতে পারবেন যতটুকু কোরআন অনুযায়ী। হয়। কোরআনের সাথে সামঞ্জস্য নেই বাসাংঘর্ষিক এমন মত, পথ বা দর্শন কখনোই গ্রহণীয় করা যাবে না, তা যত বড় দার্শনিক চাই কি পৃথিবীর সবচেয়ে বেশি দরকার কোরআন বুঝে পড়া। তিরমিজী শরীফে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ১৭১ নং হাদীসে এসেছে সেখানে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন,

অর্থ "আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হয়ে পড়বে, যার মধ্যে মাত্র একটি দল জান্নাতে যাবে।"

সাহাবীর প্রশ্ন করলেন, "কোন দল জান্নাতে যাবে?"

হযরত সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন, "যারা আমাকে, আমার সাহাবী ও কোরআনকে মেনে চলবে।"

এজন্যই কোরআন বুঝে পড়া দরকার। আমরা আবার কোরআনের আমল করবো এবঙ জান্নাতের পথ পাব। আশা করি সবাই বুঝতে পেরেছেন।

কোরআন আরবিতে নাযিলের হেতু

প্রশ্ন ঃ প্রশ্নগুলোর চিরকুট-এর মাধ্যমে সংগৃহীত। প্রশ্ন হলো প্রথমত পবিত্র কোরআন কেন আরবিতে নাযিল হলো এবং দ্বিতীয়ত আপনার কথা অনুযায়ী যেহেতু সকল মুসলমানের থেকেই আরবি শেখা উচিত, এ ব্যাপারে আই. আর. এফ. কী কর্মপরিকল্পনা হাতে নিয়েছে, বিশেষত আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থার প্রেক্ষিতে?

উত্তর ঃ হ্যাঁ, প্রশ্ন হচ্ছে কোরআন সমগ্র মানবজাতির জন্য হেদায়াত গ্রন্থ হওয়া সত্ত্বেও কেন তা আরবিতে নাযিল হলো। উত্তরে অনেক কারণ বলা যায়। প্রথমত কোরআন যে জাতীর ওপর অবতীর্ণ করা হয়েছে তাদের ভাষা ছিল আরবি। আল্লাহ্ তাআলা সকল আসমানি কিতাব যে সম্প্রদায়ের উপর নাযিল করেছেন সেই সম্প্রদায়ের নিজস্ব ভাষায় নাযিল করেছেন, যেমন তৌরাত হিব্রু, যবুর ইউনানি ভাষায়। সে সম্প্রদায়ের উপর সেই সম্প্রদায়ই যদি না বুঝতে পারে তবে তারা গ্রহণ করবে কীভাবে?

দ্বিতীয় কারণ হচ্ছে, কোরআন যে নবীর উপর নাযিল হয়, সেই নবী হযরত মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাতৃ ভাষাও আরবি। যদি কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল না হয়ে অন্য কোনো ভাষায় নাযিল হতো যা মহানবীর মাতৃভাষা নয়, তাহলে সে ভাষা যাদের মাতৃভাষা তারা আপত্তি তুলতো, আমাদের মাতৃভাষা শেখাতে এসো না। এ আপত্তির উত্তর দেওয়া বড় শক্ত হতো। এছাড়াও আরবি ভাষা একটি উন্নত ভাষা ছিল তা মৃতভাষা অর্থাৎ সাধারণ মানুষের বোধগম্যতার বাইরের ভাষা। গুটি কতক গবেষকমাত্র সেসব ভাষা জানেন। অথচ এখনো কয়েক কোটি লোক আরবী ভাষা। এই যে, এতো বিশাল পরিমাণ লোক আরবিতে কথা বলেন, তারা আরবি বুঝেন। ফলে কোরআনও বুঝেন। আরবি ভাষার আরেকটি সুবিধা হলো এটি উন্নত ও সমৃদ্ধভাষা। এর ভাব প্রকাশের ক্ষমতা ব্যাপক ও শক্তিশালী। এমন অনেক শব্দ আছে যার অর্থ ১২-১৩টি পর্যন্ত আবার একই শব্দের খাস সমার্থক শব্দও পাওয়া যায়। ফলে ভাব, ভাষা, ছন্দ ইত্যাদি মিল রেখে এ ভাষায় কোনো কিছু রচনা বেশি সার্থক হয়। উদাহরণ স্বরূপ ধরা যাক, প্রথম নাযিলকৃত দুটি আয়াত, যা সূরা আলাক-এর ১ ও ২নং আয়াতের কথা,

اِقْرَاْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِىْ خَلَقَ ـ خَلَقَ الْاِنْسَانَ مِنْ عَلَقٍ ـ

প্রথম শব্দ 'ইক্বরা' এর অর্থ হচ্ছে পড়া, আবৃতি করা ও ঘোষণা করা। এরপর 'রব' শব্দের অর্থ বুঝায় প্রভু, শাসনকর্তা ও সরবরাহকারী। তারপর আসুন 'খালাক' শব্দটির ব্যাপারে। এটির দ্বারা শুধু সৃষ্টি করাই বুঝায় না। এর দ্বারা পরিকল্পনা করা, নমনীয় করা ইত্যাদিও বুঝায়। এরপর আসুন সর্বশেষে শব্দ 'আলাক' এর সম্পর্কে- শব্দটি দ্বারা জমাট রক্ত, আঠালো বস্তু প্রভৃতি বুঝায়।

এখন আমরা যদি ঠিকভাবে অনুবাদ করি তাহলে অর্থ হবে : 'পড়, আবৃতি কর, ঘোষণা করো তোমার প্রভু মহান দাতার নামে। যিনি তৈরি করেছেন, পরিকল্পনা করেছেন এবং নমনীয় করেছেন মানুষকে জমাট বাধা রক্ত, আঠালো বস্তু হতে।'

তাই দেখা যায়, 'আরবি' ভাষায় যে ব্যাপকতা নিয়ে ভাব প্রকাশ করা যায় অন্য ভাষায় তা কল্পনাতীত। এজন্যই আমি আগেই বলেছি কোরআন তিলাওয়াতের বিভিন্ন উপায় আছে। যথা : সাধারণ ভাবে অর্থ বুঝে পড়া

ও গভীর মনোযোগের সাথে অর্থ বুঝে পড়া। সাধারণ অর্থসহ কোরআন তিলাওয়াত দ্রুতই শেষ করা যায়। কিন্তু গভীরভাবে অর্থ বুঝে কোরআন তিলাওয়াত করে শেষ করা কখনোই সম্ভব নয়।

আরবি ভাষায় কোরআন নাযিল হওয়ায় আরো সুবিধা হলো, এতে জায়গা কম লাগে। যেমন ধরুন 'মুহাম্মদ' শব্দটি। 'মম', 'হা' 'মিম', 'দাল' মাত্র চারটি বর্ণ। অথচ ইংরেজিতে এম. ইউ বা ও এইচ. এম. এস. এ. ডি অথবা অর্থাৎ ৮টি বর্ণ দরকার। ফলে অন্য ভাষায় লিখতে স্থান, সময়, শক্তিকাল বর্ণ সবকিছুই বেশি লাগে। এমনও দেখা যায় আরবি ভাষায় কোনো কিছু লিখলে যে পরিমাণ সময়, শ্রম, স্থান ও শক্তিকাল প্রয়োজন অন্য ভাষায় ঐ একই বিষয় লিখতে তার চেয়ে ৩ গুণ বেশি স্রম, সময়, স্থান ও কালি প্রয়োজন হয়। এ সকল প্রয়োজন ও সুবিধার বিবেচনা করলে পবিত্র কোরআন আরবি ভাষায় নাযিল হওয়ার যুক্তি সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু এর উদাহরণ হিসেবে ধরা যাক, যদি কেউ ফরাসি ভাষায় চিকিৎসা বিজ্ঞানের অত্যাবশ্যকীয় কিছু আবিষ্কার লিখে থাকেন, সেটা আমেরিকা বা অন্য দেশে ব্যবহার করা যাবে না। বরং ফ্রেঞ্চ ভাষা লিখে সেটি বিভিন্ন ভাষায় অনুবাদ করে সবদেশেই সব ভাষার লোকই ব্যবহার করতে পারবেন। আশা করি বুঝতে পেরেছেন।

প্রশ্ন ঃ অনেকেই 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম' না লিখে '৭৮৬' লিখে থাকে। এটা কি ঠিক?

উত্তর ঃ প্রশ্নটি হচ্ছে অনেক মুসলিম 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম পুরো না লিখে ৭৮৬ লিখে থাকে। এটা ঠিক কিনা। কেউ কেউ আরবি বর্ণমালাগুলোকে নির্দিষ্ট মান দিয়ে সেগুলোর যোগফল বের করে ঐ সংখ্যা দিয়ে আয়াত বা দোআ বা কোনো নাম নির্দেশ করার চেষ্টা করেন। উদাহরণ দিয়ে বলা যায়, 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম'-এর 'বা' 'আলিফ', 'সিন' এ বর্ণমালাগুলোর মান বসিয়ে তারা ঠিক করেছেন ৭৮৬ তেমনি ৯২ দ্বারা মুহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, এভাবে আরো অনেক কিছু। কিন্তু এমন ব্যবহার কোরআন বা হাদীসের কোথাও পাওয়া যায় না। কিছু লোক বলে যে, আমরা যখন আরবি বর্ণমালা ফন্ট না পাই, তখন দাওয়াতপত্র ভিজিটিং কার্ড ইত্যাদি ছাপতে সংখ্যাগুলো লিখি। কিন্তু আমার কথা হলো, যদি আরবি ফন্ট বা বর্ণ না পাওয়া যঅয়, তবে ইংরেজিতেই বানান করে লেখা উচিত। আর যদি মনে কর তা বুঝবে না, তবে অনুবাদ লিখতে সমস্যা কোথায়, 'পরম করুনাময় দাতা ও দয়ালু আল্লাহর নামে।' এ সহজ উপায় থাকতে এমন কঠিন ও বিদঘুটে বিষয়ের দরকার কি।

আসলে বিভিন্ন সংখ্যা নিয়ে বিভিন্ন সমাজে বিভিন্ন ধারণা রয়েছে। যেমন পশ্চিমা সমাজে ১৩ সংখ্যাটিকে অপয়া দুর্ভগা ভাবা হয়। তারা বলে 'আনলাকি থার্টিন।' আবার তারা ৬৬৬ দ্বারা বুঝায় শয়তান। আমাদের ভারতীয় উপমহাদেশে চোর, বাটপার, ঘাটে ফটকাবাজদের ও ৪২০ বলে। এর অবশ্য কারণ ও আছে, ভারতীয় উপমহাদেশের সবদেশেই যদি কোনো চোর বাটপার বা ফটকাবাজ ধরা পড়ে, তবে তাকে যে ধারায় শাস্তি দেওয়া হয় সেটি পেনাল কোডের ৪২০ নং ধারা। তাই যদিও কারণ আছে, এটি বলা অনেকে না জেনেই এটি বলে। যেমন দেখা যায় উপমহাদেশ থেকে কেউ যুক্তরাজ্যে অধিবাসী হলে তাকে ৪২০ বলা হয়। অবশ্য যারা বলেন যে, তারা বিভিন্ন বর্ণের অবস্থানগত মান যোগ করে ঐ শব্দের প্রতিনিধিত্বকারী সংখ্যা বের করেছেন, আমি তাদের সমর্থন করি না।

কারণ, একই মান হয় এমন সংখ্যা এমন দুটি শব্দের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে যার একটি ভালো অন্যটি খারাপ। সে ক্ষেত্রে আপনি কোনটি মানবেন যেমন– BAD এবং GOOD যদি বলি, ইংরেজি বর্ণের B-এর মান ১ এবং A-এর মান ৭ আর ধরুন D-এর মান চার। এখন যোগ করলে আমরা পাই ১২। অর্থাৎ BAD (খারাপ) এর সংখ্যাগত মান পেলাম ১২। এখন G এর মান ২, O এর মান ৩ এর D এর এর ৪ ধরলে DOOD এর মান কত পাই? দেখুন ২ + ৩ + ৩ + ৪ = ১২ অর্থাৎ ভালো। তাহলে ১২-কে এখন ভালো বা মন্দ কোনটা নির্দেশক বলা যাবে যদি প্রথমটি মেনে নেয়া হয় ১২ একটি মন্দ নির্দেশক তখন পরে আবার দেখলাম সংখ্যাটি যে মান ধরে নেওয়া হয়েছে তা ভালোকেও নির্দেশ করে। তাই যারা বলে 'বিসমিল্লাহ্'-এর বিভিন্ন বর্ণের মান বসিয়ে যোগফলকৃত সংখ্যা ৭৮৬ হয় তাই এটি বিসমিল্লাহ্ প্রকাশক। তাদেরকে বলি আরো এমন অনেক শব্দ ও বাক্য পাওয়া যাবে যাদের মান বসিয়ে যোগ করলে যোগফল ৭৮৬ পাওয়া যায়। সে শব্দ বা বাক্যগুলোর কিছু হবে ভালো নির্দেশক, কিছু হবে হন্দ নির্দেশক। তাই কানো মুসলমান যখন সে বলে ৭৮৬ দিয়ে তিনি বিসমিল্লাহ্ প্রকাশ করতে চান তাকে কখনোই সমর্থন করি না। আশা করি সকলেই বিষয়টি বুঝেছেন।

প্রশ্ন ঃ আমি হিন্দু ভাইয়ের সম্পূরক প্রশ্ন দিয়ে আজকের অনুষ্ঠান শেষ করবো। হিন্দু ভাইটি প্রশ্ন করেছেন পবিত্র কোরআনের বলা হয়েছে, "তোমরা কাফেরদের মেরে ফেল ও নিষিদ্ধ কর" এর পটভূমি কি একটু ব্যাখ্যা করবেন? সূরা তাওবার "কিতাল আল কাফির"-এর আলোকে ব্যাখ্যা করুন।

উত্তর ঃ হিন্দু ভাই সূরা তাওবা থেকে উদ্ধৃতি দিয়ে প্রশ্ন করেছেন যে, তোমরা কাফেরদের কেটে বা মেরে ফেল। তাদের নিষিদ্ধ কর। সূরা তাওবার ৫নং আয়াতে বলা হয়েছে–

فَاقْتُلُوا الْمُشْرِكِيْنَ حَيْثُ وَجَدْتُمُوْهُمْ ـ

অর্থ ঃ "যেখানে তুমি কাফের ও মুশরিকদের পাবে, সেখানেই তাদেরকে মেরে ফেল হত্যা কর।"

এ আয়াতের উদ্ধৃতিটি ইসলামের বিভিন্ন সমালোচক বিভিন্ন সময় বিভিন্নভাবে ব্যাখ্যা দিয়ে থাকেন। তসলিমা নাসরিনের মতো সমালোচকরা বলে, 'ইসলাম একটি উগ্রধর্ম', যেহেতু এটি কাফেরদের মেরে ফেলাতে বলে। তারা আবার 'কাফির' শব্দের পর বন্ধনীর মধ্যে 'হিন্দু' শব্দটি উল্লেখ করে বুঝতে চায় যেখানে হিন্দু পাবে সেখানে মেরে ফেল। তারা আসলে বিভ্রান্তি সৃষ্টির পাঁয়তারা ও অপচেষ্টা লিপ্ত। বিভ্রান্তি সৃষ্টিই তাদের মূল উদ্দেশ্য। মনে করুন আমেরিকার সাথে ভিয়েতনামের। সাথে যখন যুদ্ধ চলছিল তখন তখন আমেরিকার আর্মি জেনারেল বা প্রেসিডেন্ট ঘোষণা দিলেন, যেখানে ভিয়েতনামীদের পাও মেরে ফেল। যেহেতু তখন চারদিকের যুদ্ধ, তাই এ নির্দেশ তিনি দিতেই পারেন। কিন্তু আজ ঐ যুদ্ধের এতো বছর পর যদি আমেরিকার প্রেসিডেন্ট বা আর্মি জেনারেল ঘোষণা দেন, যেখানে ভিয়েতনামী পাও মেরে ফেল, তবে তা হবে নরঘাতকতার শামিল। প্রকৃতপক্ষে তিনি তা বলবেন না।

কুরআনের উক্ত আয়াতের আদেশটির পূর্বসূত্র ছিল। এজন্যই আয়াতটির পূর্বসূত্র জানা জরুরি। পূর্বসূত্র জানতে এর আগের আয়াতগুলোও পড়তে হবে। যখন আয়াতগুলো নাযিল হয় তখন মুসলিম ও কাফিরদের মাঝে একটি শান্তিচুক্তি বিরাজ করছিল যা কাফিররা একতরফাভাবে ভঙ্গ করে। তাদেরকে চার মাসের সময় বেঁধে দেওয়া হয়। তাও যখন তারা মুসলমানদের ঘর থেকে বের করে দিতে থাকে এবং হত্যা করতে থাকে তখন এ

আয়াত নাযিল করে যুদ্ধে নামার কথা বলা হয়। তাই আয়াতটি যুদ্ধাবস্থায় প্রযোজ্য। যখন মুসলমানদের ঘর থেকে বের করে দেওয়া হয় এবং হত্যা করার হয় সেই অবস্থার যুদ্ধক্ষেত্রে। কিন্তু বিভ্রান্তি শুধু এ আয়াত অর্থাৎ ৫ নং আয়াত বলে এবং এর পারে ৭নং য়াতে লাফ দেয়। কখনো তারা ৬ নং আয়াত পড়ে না। কেন পড়ে না? তাহলে বিভ্রান্তি ছড়ানো অসম্ভব হতো কারণ। কেননা ৬নং আয়াতে বলা হয়েছে, 'যদি কাফের এবং মুশরিকদের যে কেউ আশ্রয় প্রার্থনা তবে তাকে আশ্রয় দাও।' কোরআন এখানেই ক্ষান্ত হয়নি। আরো অগ্রসর হয়ে বলেছে, "নিরাপত্তার সাথে তাকে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। যাতে তারা আল্লাহর বাণী শুনতে পারে।" কোরআন বলেনি যারা আশ্রয় চাইবে তাদের শুধু মৃত্যু থেকে বাঁচিয়ে তাদের মতো করে ছেড়ে দাও। বরং আদেশ দিয়েছে যেন তাদেরকে নিরাপত্তা নিশ্চিত করে নিরাপদ স্থানে স্থানান্তর করা হয়।

বলুন তো, আজকের দিনের কোন আর্মি জেনারেল তার সৈন্যদের এ আদেশ দিবে যে, তোমাদের শত্রুরা আশ্রয় চাইলে তাকে নিরাপত্তা দিয়ে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যাও। কোনো আর্মি জেনারেলই বলবে না। অথচ কোরআন নির্দেশ দিয়েছে কাফের বা মুশরিকরা যদি আশ্রয় চায় তবে তাদের নিরাপত্তাই শুধু দিবে না বরং নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ স্থানে নিয়ে যেতে হবে। যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে যুদ্ধবস্থা ছিল তখন নির্দেশ করা হয়েছে তোমরা ভয় পেও না। যারা তোমাদের ঘর থেকে বের করে দিয়েছে তাদের খুঁজে বের কর ও হত্যা কর। আবার এটাও নির্দেশ দিয়েছে যে তারা আশ্রয় চাইলে তাদেরকে নিরাপত্তার সাথে নিরাপদ জায়গায় নিয়ে যাও। তাই ইসলাম মুসলিমদের যে পরিমাণে হৃদ্যতার প্রতি উৎসাহ দেয়, তা যে কোনো সংস্থা UN হোক বা মানবাধিকার সংস্থাই হোক (যাদের কথা সব সময় বরা হয়) তারা যেসব অধিকারের কথা বলে তা ইসলাম কোরআনপাকের মাধ্যমে প্রায় দেড় হাজার বছর আগে বলে এসেছে।

আজ 'হিউমান রাইট', 'উইমেন রাইটস' সহ সকল সংস্থা বলে 'শান্তি চাই', 'শান্তির সাথে বাঁচতে চাই'। অথচ এ শান্তির কথা বহু আগেই কোরআনের কোরআনের এসেছে। যদিও এ শান্তির কথা কেরআন থেকে নেওয়া এবং মুসলিমদের পবিত্র গ্রন্থ, তাই তারা এটার কোনো উদ্ধৃতি দেয় না। আজকে হিউম্যান রাইটসের প্রবক্তারা যে কথা বলছে যে মানুষের লিঙ্গ, গোত্র, বর্ণ, ইত্যাদি বৈষম্য করা উচিত নয়। সবাই সমান মর্যাদা পেতে হবে সেটা কোরআনই সর্বাগ্রে বলেছে। তাই কোরআন আবদ্ধ করে না রেখে পৃথিবীর প্রতিটি ভাষায় এটি অনুবাদ করে বিনা মূল্যে বিতরণ করা উচিত।

মহান আল্লাহ্‌র দরবারে এ জন্য ধন্যবাদ শোকর জ্ঞাপন করছি যে, আমরা আজকের অনুষ্ঠান সুন্দরভাবে শেষ করতে পেরেছি। আই. আর. এফ-এর পক্ষ থেকে আজকের অতিথি ও শ্রোতা ভাই-বোনদের ও ধন্যবাদ জানাচ্ছি ধৈর্যের সাথে শোনার জন্য। আমরা মিডিয়ার কলাকুশলীদেরও ধন্যবাদ জানাই। এছাড়া স্বেচ্ছাসেবক, আয়োজক সবাইকে ধন্যবাদ। আশা করি জাকির নায়েকের পরবর্তী অনুষ্ঠানের আবারও দেখা হবে ইন্‌শাআল্লাহ।

আল কোরআনের মৌলিক তথ্য

আল কোরআনের কয়েকটি উল্লেখ যোগ্য নাম

আল-কোরআনের সেফাতী বা গুণগত নাম প্রায় ৫৬ প্রকার। যেমন : আল-কুরআন, আল-ফুরকান, আল-কালাম, আল-হুদা, আন-নুর, আয-যিকর, কিতাবুল-মুমিন, কিতাবুল মাসানী, আল-হিকমত, কিতাবুল

হাকীম, সিরাতুম-মুস্তাকিম, কোরআন মজীদ, কোরআনুল কারীম, কোরআনুল সেফা, কোরআনুদ্দোয়া, কোরআনুল হাকিম।

কোরআন অধ্যয়নের সমস্যা এর ও সমূহ সমাধানের উপায় আল-ফুরকান

সমস্যাসমূহ :

১। অন্যান্য সাধারণ গ্রন্থের মতো মনে করা।

২। একই বিষয়ের বার বার উল্লেখ।

৩। কোনো বিষয়সূচি নেই।

৪। কুরআন নাজিলে প্রেক্ষিাপট বা মানে নজুল না জানা।

৫। নাসেখ ও মানসুখ সমস্যা। এক আয়াতের পরিবর্তে যে আয়াত নাযিল হয় তাকে 'নাসেখ' বলে। যে আয়াত রহিত হয় তাকে 'মানসুখ' বলে।

সমাধানের উপায়।

১। অধ্যয়নের সময় নিরপেক্ষ দৃষ্টি ভঙ্গি নিয়ে বসা।

২। কোরআন নাযিলের প্রেক্ষাপট ও রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপ্লবী আন্দোলনের বিভিন্ন অবস্থা ও পর্যায় সম্পর্কে সুস্পষ্ট জ্ঞান থাকা।

৩। ঘরে বসে কোরআন বুঝার সাথে সাথে কোরআন প্রতিষ্ঠার আন্দোলনের শরীক হওয়া।

কোরআনের আয়াতের প্রকার ভেদ

হুকুমের দিক থেকে কোরআনের আয়াত ৩ প্রকার যথা : ১. হালাল, ২. হারাম এবং ৩. আমছাল।

শব্দের দিক থেকে কোরআনের আয়াত ২ প্রকার যথা : ১ মুহকামাত (স্পষ্ট আয়াত) ২. মুতাশাবিহাত (অস্পষ্ট আয়াত)।

মুহকাম পাকাপোক্ত জিনিসকে বলা হয়। এর বহু বচন 'মুহকামাত'। মুহকামাত আয়াত বলতে বুঝায়, কোনো প্রকার সংশয় সন্দেহের অবকাশ থাকে না। এ আয়াতগুলো কিতাবের আসল বুনিয়াত বা ভিত্তি। এ আয়াতগুলোর মাধ্যমে দুনিয়াবাসীকে ইসলামের আহ্বান জানানো হয়েছে। 'মুহাসাবিহাত' অর্থ যে সব আয়াতের অর্থ গ্রহণে সন্দেহ সংশয়ের ও বুদ্ধিকে আচ্ছন্ন করে দেবার অবকাশ রয়েছে। (সূরা আলে ইমরান, তাফহীমুল কোরআন ব্যাখ্যা অংশ)।

কোরআনের সূরা সমূহ

কোরআনের সূরা দুই প্রকার। যথা : ক. মাক্কী সূরা ও খ. মাদানী সূরা।

ক. মাক্কী সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাক্কী জীবনে অথবা হিজরতের পূর্বে নাজিল হয়েছে ঐ সব সূরা মাক্কী সূরা।

বৈশিষ্ট্যসমূহ

১. এ সকল সূরা ও আয়াতগুলো ছোট ছোট, সহজে মুখস্থ করার যোগ্য ও ছন্দময়।

২. তাওহীদ, রিসালাত এবং আখিরাত সংক্রান্ত বিষয়াবীর আলোচনা।

৩. মাক্কী সূরা ব্যক্তি গঠনে হেদায়েত পূর্ণ।

৪. মানুষের ঘুমন্ত বিবেক ও নৈতিকতাবোধ জাগ্রত করে চিন্তা শক্তিকে সত্য গ্রহণের উদ্বুদ্ধ করা।

৫. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে দেওয়া বিরাট দায়িত্ব পালনের উপযোগী উপদেশ।

খ. মাদীনী সূরা : যে সমস্ত সূরা রাসূলের সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হিজরতের পথে অথবা মাদানী যুগে অবতীর্ণ হয়েছে।

বৈশিষ্ট্যসময়ূহ

১. দীর্ঘ সূরা ও আয়াত।

২. সামাজিক বিধি-বিধান, ফৌজদারী আইন, উত্তরাধিকারী বিধান, বিয়ে-তালাক ইত্যাদি বিষয়ে আলোচনা।

৩. জয়-পরাজয়, শান্তি, ভীতি অবস্থায় মুসলমানদের কর্তব্য বিষয়ক আলোচনা।

৪. দল, রাষ্ট্র, সভ্যতা ও সামাজিকতার ভিত্তি সম্বন্ধে আলোচনা।

৫. যুদ্ধ, সন্ধি, মুনাফিক ও কাফিরদের সাথে আচরণ সম্পর্কিত আলোচনা।

হুরুফে মুকাত্তাআত কী?

সূরা শুরুতে একক উচ্চারণের কিছু হরফকে বলা হয় **'হুরুফে মুকাত্তায়াত'**। যেমন : আলিফ, লাম, মীম। আলীফ, লাম, রা।

আল-কোরআনের পরিসংখ্যানগত দিক

১. পারা ৩০, সূরা ১১৪. ,মাক্কী ৮৬/৮৯/৯২/৯৩, মাদানী ২৮/ ২৫/২২/২১, আয়াত ৬৬৬৬ রুকু ৫৫৪/ ৫৪০, সিজদা ১৪, অক্ষর ৩,৩৮, ৬০৬/ ৩,৩৮,৬৭১, ওয়াকফ ৫,০৫৮টি।

২. সূরা তাওবায় বিসমিল্লাহ নেই। সূরা নমলে বিসমিল্লাহ ২ বার।

৩. ১১৪টি সূরার মধ্যে দুটি সূরার নাম করণ আলাদা অর্থাৎ নামকরণের শব্দ নেই। যথা সূরা ফাতিহা ও সূরা ইখলাস।

৪. সর্বপ্রথম নাজিলকৃত পূর্ন সূরা হলো সূরা মুদ্দাসির।

৫. সর্বশেষ নাজিলকৃত সূরা হলো- সূরা নাসর।

৬. সর্বাপেক্ষা বড় সূরা হলো- সূরা আল-বাকারা।

৭. সর্বাপেক্ষা ছোট সূরা হলো- সূরা আল-কাওসার।

৮. হরকত সংযোজন করেন হাজ্জাজ বিন ইউসুফ (উমাইয়া খলিফা হাজ্জাজ বিন ইউসুফের সময় ৭০৮ খ্রি. বিশিষ্ট ওলামায়ে কিরমদের দ্বারা কুরআনের জের, জবর, পেশ ইত্যাদি বসানো হয়)।

৯. কুরআনের প্রথম আংশিক বাংলা অনুবাদ করেন মাওলানা আমীর উদ্দীন বসুনিয়া।

১০. পূর্ণাঙ্গ অনুবাদ করেন গিরিশ চন্দ্র সেন।

১১. আল-কুরআন মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাসনাক্রমে আরবের সাতটি আঞ্চলিক ভাষার মধ্যে কুরায়েশী ভাষায় নাযিল হয়।

আয়াতের শ্রেণীবিভাগ

ওয়াদা ১,০০০ আয়াত, ভীতি প্রদর্শন ১,০০০ আয়াত। অবিশ্বাসী ফাসেক, মোনাফেক ও শয়তানের অনুসারীদের পরিণতি ও শাস্তি বিষয়ক ১,০০০ আয়াত। আদেশ, বিষয়ক ১,০০০ আয়াত। নিষেধ বিষয়ক ১,০০০ আয়াত। হালাল বিষয়ক ২৫০ আয়াত, হারাম ২৫০ আয়াত। দৃষ্টান্ত মূলক ১,০০ আয়াত। কেচ্ছা-কাহিনী ৫০০ আয়াত, আল্লাহ পাকের তাসবিহ বিষয়ক ১০০ আয়াত। নামায সম্বন্ধে ১৫০ আয়াত। নাসেখ মানসুখ বা হুকুম সংশোধন সম্পর্কিত বর্ণনা ৬৬টি আয়াত। এমনিভাবে নামায, রোজা, হজ্জ, যাকাত, ইত্যাদি বিষয়ে এ বিভক্ত করা যায়। নিম্নে কতিপয় বিজ্ঞান ভিত্তিক আয়াত তুলে ধরা হলো :

১. **রাষ্ট্রবিজ্ঞান :** সূরা নাস, সূরা মায়েদা ১৮, ১৯; সূরা আল-বাকারা ১৩০, ১৬৫; সূরা আরাফ ৫৪; সূরা ইউসসুফ ৪০; সূরা ইউনুস ১৯; সূরা আলে ইমরান ৩২, ৩৩; সূরা নুর ৫৪; সূরা মুহাম্মদ ৩৩।

২. **অর্থনীতি :** সূরা বাকারা ২১৯, ১৭৭; সূরা নিসা ৫, ৭, ২৯, ৩২; সূরা আনফাল ৬৯; সূরা সফ ১১; সূরা যারিয়াত ১৯।

৩. **যুদ্ধ বা সমর বিজ্ঞান :** সূরা আনফাল ১৫, ১৭, ৩৯, ৪১, ৬০, ৬১, ৬৫; সূরা তওবা ৯০-৯২।

৪. **যুক্তিবিদ্যা ও দর্শনশাস্ত্র :** সূরা রা'দ ৩; সূরা নুর ১৫; সূরা ত্বোহা ৫৩-৫৪; সূরা বনি ইসরাইল ৮৪; সূরা রহমান ১-৪, ২৬-২৭; সূরা বাকারা ৩; সূরা হাশর ২২; সূরা ইব্রাহিম ৪৮; সূরা নুহ ১৭, ১৮; সূরা হা-মিম ১০, ৩৯; সূরা আম্বিয়া ৩৪, ৩৫, ১০৪।

৫. **নীতি বিজ্ঞান :** সূরা মা' আরিজ ১৯; সূরা তাকাছুর ১; সূরা বনী ইসরাইল ১৬, ২৩, ২৭; সূরা আরাফ ১০, ৩১; সূরা নহলো ৯, ৯০; সূরা নসিা ১০, ২৮, ২৯, ৫৮; সূরা আলাক ১; সূরা বালাদ ১৪-১৬; সূরা বাকারা ৪৩।

৬. **আইন বিজ্ঞান :** সূরা বাকারা ১৭৮-১৮৩; সূরা ইয়াসীন ৪০; সূরা রা'দ ৩৭; সূরা মুমতাহীনা ১২।

৭. **মনোবিজ্ঞান :** সূরা ফাতির ৩৮; সূরা মা'আরিজ ১৯; ইউসুফ ৪৩, ৫৩; সূরা বাকারা ২৩৩; সূরা লোকমান ১৪; সূরা হা-মিম ৩৬।

৮. **সৌন্দর্য বিজ্ঞান :** সূরা হীন ৪, সূরা কাহাফ ৪৬; সূরা আরাফ ৩১, ৩২, ১৬০; সূরা ত্বোহা ৮১; সূরা মুলক ৫; সূরা নুর ৩৫।

৯. **ভাষা বিজ্ঞান :** সূরা বাকারা ৩; সূরা আলাক ১-৫ সূরা আর রাহমান ৩, ৪; সূরা রুম ২২।

১০. **পরিবেশ বিজ্ঞান :** সূরা জাসিয়া ৪; সূরা ইসরাইল ৫৩; সূরা আর রাহমান ৩, ৪; সূরা নিসা ৩৬; সূরা রুম ৪৬; সূরা ফুরকান ৪৫, ৪৬।

১১. **ইতিহাস বিজ্ঞান :** সূরা আরাফ ৮০-৮১; সূরা বুরুজ ২২; সূরা ত্বীন ২৮; সূরা ত্বীন ৮; সূরা কাফ ১৭-১৮; সূরা গাসিয়া ২৬; সূরা যিলযাল ৭-৮; সূরা নিসা ৬।

১২. ব্যবস্থাপনা বিজ্ঞান : সূরা সাজদা ৫; আল-সূরা বাকারা ২৫৫; সূরা মুয্যাহিলো ৯; সূরা আনআম ৭৫; সূরা হা-মিম ৯-১২; সূরা মূলক ৩।

১৩. সমাজবিজ্ঞান : সূরা ফুরকান ৫৪; সূরা আরাফ ৩৪; সূরা ইউসুফ ১৩-১৪; সূরা তওবা ৬০; সূরা নাহলো ৯০।

১৪. পরিসংখ্যান বিজ্ঞান : সূরা ফুরকান ২; সূরা ইনফিতার ১০-১২; সূরা মুদ্দাসির ৩০; সূরা মুমিনুন ১৭; সূরা আল বাকারা ৪৩, ১৮৩, ১৯৬; সূরা আল মায়িদা ৬।

১৬. খাদ্য বিজ্ঞান : সূরা আরাফ ৩১ সূরা মায়িদা ৩, ৪; সূরা নহল ১১ সূরা মরিয়ম ২৫, সূরা আল বাকারা ৬১।

১৭. জ্যোতির্বিজ্ঞান : সূরা আরাফ ১৮৫, সূরা আলে ইমরান ১৯০; সূরা ক্বাফ ৬, সূরা নাবা ১২, সূরা রাদ ২, সূরা হামীম ১২, সূরা ইবরাহিম ৩৩।

১৮. ভূতত্ত্ব বিজ্ঞান : সূরা হা-মীম ৯, সূরা নাযিয়াত ৩০, ৩২ সূরা নাবা ৬, ৭; সূরা লুকমান ১০, সূরা ফাতির ২৭, সূরা নূহ ১৯, সূরা নাহলো ১৫, সূরা যারিয়াত ৪৮।

১৯. পুষ্টি বিজ্ঞান : সূরা ইয়াসিন ৩৪-৩৫, সূরা নহল ৬৯, সূরা ইয়াসিন ৭১, ৭৩।

২০. আবহাওয়া বিজ্ঞান : সূরা-বাকারা ১৪৬, সূরা জাসিয়া ৫।

২১. নৃ-বিজ্ঞান : সূরা আনআম ২, ৬; সূরা রহমান ৪; সূরা ইউনুস ১৯; সূরা হুজুরাত; সূরা মুমিনুন ৪২, সূরা নজম ৫৩; সূরা রুম ২২; সূরা ফাতির ২৮; সূরা হাদিদ ২৫।

২২. পানি বিজ্ঞান : সূরা নূর ৪৩, সূরা মুলক ৩০, সূরা জুমার ২১; সূরা মুমিনুন ১৮; সূরা ওয়াকিয়া ৬৮-৭০।

২৩. স্থাপত্য বিজ্ঞান : সূরা লোকমান ১০; সূরা মুলক ৩; সূরা কাফ ৬; সূরা মুমিনুন ১৭; সূরা সাফফাত ৩৬।

২৪. সামুদ্রিক বিজ্ঞান : সূর নহল ১৪; সূরা ফুরকান ৫৩।

২৫. মৃত্তিকা বিজ্ঞান : সূরা ফাতির ২৭।

২৬. চিকিৎসা বিজ্ঞান : সূরা নহলো ৬৯, সূরা আল বাকারা ২৩৩; সূরা দাহর ৫, ১৭; সূরা ত্বীন ১।

২৭. স্বাস্থ্য বিজ্ঞান : সূরা রাদ ২৭; সূরা মুদ্দাচ্ছির ৩-৫।

২৮. প্রজনন বিজ্ঞান : সূরা ইয়াসিন ৩৬; সূরা নাহল ৪; সূরা দাহর ২; সূরা নজম ৪৫-৪৬; সূরা নুহ ১৪; সূরা লুকমান ১০; সূরা ত্বোহা ৫৩।

২৯. ভ্রূণ বিজ্ঞান : সূরা নাহল ৪; সূরা দাহর ২; সূরা সাজদা ৮, ৯; সূরা মুমিনুন ১১, ১৩।

৩০. উদ্ভিদ বিজ্ঞান : সূরা নাযিয়াত ৩১; সূরা ত্বোহা ৫৩; সূরা রা'দ ৪; সূরা নূহ ১৭-১৮।

৩১. গ্রহ গতিবিজ্ঞান : সূরা ইউসুফ ৪; সূরা আম্বিয়া ৩৩; সূরা ইয়াসিন ৪০; সূরা আরাফ ৫৪ সূরা ফুরকান ৬১; সূরা তাকভীর ১-২।

৩২. রসায়ন বিজ্ঞান : সূরা আম্বিয়া ৩০; সূরা নহল ৬৬; সূরা ওয়াকিয়া ৫৮, ৫৯।

৩৩. পদার্থ বিজ্ঞান : সূরা যুখরুখ ১২; সূরা যারিয়াত ৪৯; সূরা হিজর ১৯; সূরা কামার ৪৯; সূরা ফুরকান ২; সূরা তালাক ৩; সূরা হাক্কা ১৩-১৫; সূরা সাবা ৩।

৩৪. **জীববিজ্ঞান :** সূরা নূর ৪৫; সূরা গুরা ১১; সূরা আরাফ ১৮৯; সূরা নজম ৪৫-৪৬; সূরা নুর ৪৫।

৩৫. **কৃষিবিজ্ঞান :** সূরা যুমার ২১; সূরা ইয়াসিন ৩৪; সূরা মুমিনুন ১৮; ২০; সূরা হজ্জ ৫; সূরা আনআম ৯৯।

৩৬. **গার্হস্থ্য বিজ্ঞান :** সূরা আরাফ ৩১; সূরা দাহর ৫, ১৫, ১৬, ২১; সূরা মুদ্দাচ্ছির ৪, ৫; সূরা মুমিনুন ২০।

৩৭. **যৌন বিজ্ঞান :** সূরা নূর ২৭, ৩০-৩৩, ৮৬; সূরা তারিখ ৬,৭; সূরা বাকারা ২২৩।

৩৮. **ভূ-বিজ্ঞান :** সূরা আম্বিয়া ৩০; সূরা শামস ৬; সূরা মূলক ১৫, সূরা সাজদা ৪, সূরা তওবা ৩৬; সূরা লুকমান ১০, ২৯; সূরা নহল ১৫।

৩৯. **প্রেম বিজ্ঞান :** সূরা বাকারা ১৯৫, ২৩৫-২৩৭; সূরা আনআম ১৬২; সূরা ইউসুফ ২৩-২৭; সূরা সফ ৪।

৪০. **ইতিহাস বিজ্ঞান :** সূরা বাকারা ৬৭-৭৩, ১৩৫-১৪১, ২৪৮; সূরা আলে ইমরান ৪; সূরা মায়েদা ১৫, ১৭; সূরা ইউসুফ ৩-৫, ১৯-২১; সূরা কাহাফ ৬৫-৮২, ৯৪-৯৮, সূরা মারইয়াম ৭, ৩৪, ৫১, ৫২; সূরা হজ্জ ৪১-৪৪, ৭৮; সূরা আসসাফফাত ১০০-১০৫; সূরা আত তাহরীম ১০-১২।

৪১. **হিসাব বিজ্ঞান :** সূরা জিন ২৮, সূরা ত্বীন ৮, সূরা ক্বাফ ১৭-১৮; সূরা গাশিয়া ২৬; সূরা যিলযাল ৭-৮; সূরা নিসা ৬; সূরা ইউনুস ৫, সূরা তওবা ৩৬।

মহাগ্রন্থ আল-কুরআনের ভাষায় বলতে চাই। মহান আল্লাহ সূরা আরাফ-এর ৪০ নং আয়াতে বলেছেনে, "ইন্নাল লাজিনা কাজ্জাবু ও বি আয়াতিনা ওয়াছতাকবারুও লা তুফাততাদু লা হুম আব ওয়া বুশশামা-ই ওয়ালা ইয়াদ-খুলওনাল জান্নাতা হাত্তা ইয়ালিজাল জামালু দি ছাহেল কিয়াতে। ওয়া কাজালিকা নাজজিল মুজরিমিন।"

"নিশ্চয় যারা আমার আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছে এবং এগুলো থেকে অহঙ্কার করেছে, তাদের জন্য আকাশের দ্বারা উন্মুক্ত করা হবে না এবং তারা জান্নাতে প্রবেশ করতে পারবে না। যে পর্যন্ত না সূচের ছিদ্র দিয়ে উট প্রবেশ করে। আমি এমনিভাবে পাপীদের শাস্তি প্রদান করি।"

সূরা আর রহমান-এর ৩৩ নং আয়াতে তিনি বলেন, "ইয়া মা শারাল জিন্নি ওয়াল ইনসি ইনেশ তাতা আতুম আন তানফুজুও মিন আকতারশ সামাওয়াতি ওয়াল আরদি ফানফুজুও লা তানফুজুওনা ইল্লা বি সুলতান।"

অর্থঃ "হে জ্বিন ও মানুষ জাতি! তোমরা যদি পৃথিবী ও নভোমণ্ডলের সীমানা অতিক্রম করে কোথাও পালিয়ে যেতে পার হবে তাই যাও। কিন্তু না, পালিয়ে যেতে পারবে না। কেননা সে জন্য খুব বেশি শক্তি-সামর্থ্যের প্রয়োজন।"

তাই আসুন আমরা সকলেই এই কোরআন বুঝে শুনে অধ্যয়ন করি। কেবল তিলাওয়াত আর খতম দিলেই এর প্রকৃত সাধ পাওয়া সম্ভব নয়। সাহাবায়ে কিরামগণ দীর্ঘ সময় ধরে এক একটি সূরা অধ্যয়ন করেছেন এবঙ তার আমল প্রতিষ্ঠা করে অন্য সূরায় হাত বুলিয়েছেন। বিশেষ করে হযরত উমর ফারুক (রা) এ কাজ করতেন। প্রকৃত কথা হচ্ছে আল কোরআন কেবল মুসলমানদের জন্য নয়। এটি বিশ্ব মানবতার জন্য প্রেরিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ সূরা আল বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে বলেন,

অর্থঃ "যা (আল কুরআন) মানুষের জন্য হেদায়েত এবং সত্য পথযাত্রীদের জন্য সুস্পষ্ট পথ নির্দেশ, আর ন্যায় ও অন্যায়ের মাঝে পার্থক্য বিধানকারী।"

"গৌরবহীন বেঁচে থাকার তুলনায় গৌরবময় মৃত্যুও অনেক ভালো"।

সাহিত্য সৌন্দর্য বর্ণিত কোরআনে নবী-রাসূল

এক ঐতিহাসিক সত্যতার মধ্য দিয়ে হেরো পর্বতের গুহায় মহাগ্রন্থ আল-কোরআনের নাযিল শুরু হয়। ৬১০ খ্রিষ্টাব্দের কোনো একদিনে 'ইকরা' আল-কোরআনের প্রথম নাযিলকৃত শব্দ। ১০৪ খানা আসমানি কিতাবের মধ্যে সর্বশেষ ও সর্বশ্রেষ্ঠ আসমানি কিতাব আল কোরআন। কিন্তু আরবের তৎকালীন সমাজব্যবস্থা ছিল অত্যন্ত ন্যক্কারজনক। যার অধিবাসীরা তাদের মেয়েদেরকে জীবন্ত কবর দিতে কুণ্ঠিত হতো না। হত্যা, লুণ্ঠন, অত্যাচার-অবিচারসহ হাজার বছর ধরে গোত্রীয় যুদ্ধে তাদের অধিবাসীদের হিংস ও বর্বর করে তুলেছিল। আবার হাজারো বর্বর লোকদের মাঝে আতিথিয়তার গুণ ছির প্রবল। এ সময়টাকে 'ইউরোপের অন্ধকার যুগ' বলা হয়। ভারতে কিছুটা জ্ঞান-চর্চা থাকলেও আরব ছিল তখন আইয়্যামে জাহিলিয়ার যুগ। মূলত এটা ছিল অজ্ঞতাও অন্ধকারাচ্ছন্ন যুগ। তবে অজ্ঞতার এই মরুপিঠে কিছু শান্ত-জ্ঞানী এবং সাহিত্যমোদি লোক ও ছিল। শাহ্ ওয়ালিউল্লাহ দেহলোভীর ভাষ্যমতে, 'সে সময় আরবে মাত্র হাতে গোণা ১৮ জন মানুষ লেখাপড়া জানতো।' এতে ক্ষুদ্র সংখ্যক লোকের মাঝে এ গ্রন্থের সাহিত্য সৌন্দর্য কীভাবে বিস্তার লাভ করল তা আলোচনা করা হলো ঃ

আল কোরআন সংকলনের ইতিহাস

মহাগ্রন্থ আল-কোরআন নাযিল হওয়ার সাথে সাথেই মুসলমানদের মধ্যে কোরআন কণ্ঠস্থ করার প্রবণতা ছিল। এমনকি মহানবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজের কাতেবদের (লেখক) সাহায্যে বিভিন্নভাবে লিখে রাখতেন। হযরত আবু বকর (রা)-এর খিলাফতকালে ইয়ামামা নামক স্থানে ভণ্ডনবী মুসায়লামাতুল কায্যাবের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে গিয়ে বেশ কিছু সংখ্যক কুরআনের হাফেজ শহীদ হন। হযরত আবু বকর (রা)-এর উদ্যোগে, হযরত উমর ফারুক (রা)-এর পরামর্শে মহানবী সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রধান কাতেব (লেখক) হযরত যায়েদ বিন সাবিতের ওপর সংকলনের দায়িত্ব দেয়া হয়। অতঃপর মূল পাণ্ডুলিপি হযরত আবু বকর (রা), হযরত উমর (রা), হযরত উমর (রা)-এর কন্যা ও রাসূল সাল্লাল্লাহ্ আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর পত্নী বিবি হাফসার নিকট রেখে যান।

তপর ইসলামের ব্যাপক প্রচার ও প্রসারের ফলে বিভিন্ন ভাষাভাষীদের মাঝে কুরআনের উচ্চারণ ভিন্ন হতে থাকে। তাদের মাঝে কোরআন আঞ্চলিকতার প্রভাব প্রকট ভাবে দেখা যায়। এ অবস্থায় হযরত উসমান (রা), হযরত যায়েদ বিন ছাবিত (রা), আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের (রা), হযরত সাঈদ বিন আস (রা), হযরত আবদুল্লাহ বিন হারিছ বিন সাআদ (রা) ও হযরত হিশাম (রা)-কে নিয়ে পূর্বের সংকলিত গ্রন্থের অনুরূপ কোরআনের প্রামাণ্য সংস্করণ তৈরি করার সংস্থা গঠন করা হয়। গঠিত সংস্থা নির্ভুলভাবে যে অনুলিপিগুলো তৈরি করেন তা হযরত উসমান (রা) সরকারি ব্যবস্থাপনায় বিশ্বের দেশে দেশে পাঠিয়েছিলেন। সুতরাং মহাগ্রন্থ আল-কুরআন এমন একটি নিখুঁত গ্রন্থ যা ঐতিহাসিকভাবে সত্য বলে প্রমাণিত হয়েছে।

সাহিত্য সৌন্দর্য আল-কুরআন

সাহিত্য তার নিজস্ব সত্তাকে বিকশিত ও প্রতিষ্ঠিত করতে চায়। নিজ ভাব, ভাষা, অলঙ্কার, ছন্দ-মুর্ছনা, উপমা, ভাষার লালিত্য, ভাবের নিজ বা গভীরতা, মর্মস্পর্শী সুর ঝংকারে জয়গান গাইতে চায়। মহাগ্রন্থ

আল-কোরআনের শুরুতে সেই ঝংকারের জয় ডঙ্কা প্রতিধ্বনিত হয়। বিশ্বসাহিত্যের রূপকার স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন, "যালিকাল কিতাবু লা রাইবা ফিহি, হুদাল্লিল মুত্তাকিন।" অর্থাৎ, "ইহা সেই কিতাব এতে কোনো প্রকার সন্দেহের অবকাশ নাই। মুত্তাকীদের জন্য ইহা পথ প্রদর্শক।" (সূরা আল-বাকারা)

আল-কোরআনের সাহিত্য সৌন্দর্য বর্ণনা করতে গিয়ে মাওলানা মোহাম্মদ আলী তাঁর "The Religion of Islam' গ্রন্থের এক স্থানে বলেন, "সত্য বলতে গেলে আল কোরআনের পূর্বে আরবির কোনো অস্তিত্ব ছিল না। যে কয়েকটি কবিতার অস্তিত্ব ছিল তা মদ, নারী, ঘোড়া কিংবা তলোয়ারের বাইরে কখনোই যেতে পারেনি। কুরআন নাযিলের সাথে সাথে প্রকৃতপক্ষে আরবি এক শক্তিশালী সাহিত্য হিসেবে আত্ন প্রকাশ লাভ করে বহুদেশে সমাদৃত হয় এবং বহু জাতীয় সাহিত্যের উপর প্রভাব বিস্তার করে। মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীন অত্যন্ত খুশি হয়ে ফেরেশতাকুলের সাথে গর্ব করে আশরাফুল মাখলুকাত সৃষ্টি করেছেন। যুগে যুগে মানুষদের পথ প্রদশনের জন্য সুপথ দেখানোর জন্য কালে কালে নবী-রাসূল ও কিতাব নাযিল করেন। কিন্তু হযরত ঈসা ইবনে মরিয়ম (আ) থেকে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নবুয়ত ঘোষণা পর্যন্ত প্রায় ৬০০ বছর পৃথিবীর কোনো এলাকায় নবী-রাসূল প্রেরিত হয়নি। মানব কল্যাণের জন্য কোনো কিতাব-সহীফাও নাযিল হয় নি। দীর্ঘ সময় পর যে আগমন ঘটে ছিল সেই কোরআনের সম্পর্কে মহান আল্লাহ বলেন, "যদি আমি এই কোরআন পাহাড়ের উপর নাযিল করতাম। তবে তুমি দেখতে যে, পাহাড় বিনীত হয়ে আল্লাহ তা'আলার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে গেছে।"

কুরআনের মান সম্পর্কে বলতে গিয়ে ঐতিহাসিক P. K. Hitti বলেন, "The style of the Quran is Gods style. It is different in comparable and inimitable. This basically what constitutes the miraculous character ot the Quran.

অর্থাৎ "কোরআনের ব্যাখ্যা (বিষয়বস্তু, বর্ণনা, নিয়ম) হলো স্রষ্টার বিষয়। কোরআন কোনো কিছুর সাথে তুলনা ও অনুকরণ হতে সম্পূর্ণ আলাদা। কোরআনের গঠন শৈলীতে এক প্রকার অলৌকিক বৈশিষ্ট্য বিরাজমান।"

আল কোরআনের এ অভিনব প্রচলিত সাহিত্যের দৃষ্টিতে গদ্যও নয়, পদ্যও নয়। মহাগ্রন্থ আল-কুরআন হচ্ছে গদ্য ও পদ্যের সংমিশ্রণে বিশুদ্ধ রচনা। সকালের সূর্য তাপে যেমন কোনো দুর্বা ঘাসের উপর শিশির থাকতে পারে না ঠিক তেমনি আল-কোরআনের উপর কোনো সাহিত্যের স্থান কল্পনা করা যায় না। আধুনিক সমাজ ব্যবস্থায় বিভিন্ন ভাষা যেমন : বাংলা, ইংরেজি ভাষার নতুনত্ব আসছে। ঠিক তেমনিভাবে আরবি ভাষার এমন কিছু রদবদল হলে এর প্রভাব কুরআনের উপর বর্তাতো। কিন্তু স্রষ্টা তার মহান সৃষ্টির শৈল্পিক মান, অর্থের ব্যাপকতা এতোই রঙে রাঙিয়েছেন যে, সকল যুগের সকল মানুষের সমস্ত প্রতিভা ও যোগ্যতাকে একত্র করেও আল কুরআনের একটি বাক্য তুল্য শব্দ বা অক্ষর সংযোজন করা সম্ভব নয়। স্বয়ং আল্লাহ বলেন "এতদসম্পর্কে যদি তোমাদের কোনো সন্দেহ থাকে যা আমি আমার বান্দার প্রতি নাযিল করেছি, তাহলে এর মতো একটি সূরা রচনা করে দেখাও। তোমাদের সে সব সাহায্যকারীদেরকে সাথে নাও - এক আল্লাহ ছাড়া, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। আর যদি তা না পারো, অবশ্য তা তোমরা কখনো পারবে না। তাহলে সে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা পাওয়ার চেষ্টা কর, যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর। যা তৈরি করা হয়েছে কাফিরদের জন্য।" (সূরা বাকারা, আয়াত ২৩-২৪)

যদি এ কুরআনের মধ্যে মানুষের তৈরি বাক্য যোগ করার সুযোগ থাকতো বা মিশ্রণ হতো তাহলে এর মধ্যে অসঙ্গতি দেখা দিত। এ প্রসঙ্গে মহান আল্লাহ বলেন, "আফালাইয়াতাদাব্বারুনাল কুরআনা ওয়ালাওকানা মিন ইনদি গাইরুল্লাহি লাওয়া জাদুও ফিহি লোতিলাফান কাছিরা।" অর্থ : "তারা কি গভীর মনোনিবেশ সহকারে কুরআনকে চিন্তা করে না? যদি এটা আল্লাহ ভিন্ন অন্য কারো পক্ষ হতে আসত, তবে এর মধ্যে অনেক কিছুই বর্ণনা বৈষম্য দেখা যেত।" (সূরা নিসা, আয়াত- ৮২)

আল-কুরআনের বিষয়বস্তু হচ্ছে ঈমান, তাওহীদ, রিসালাত, আখিরাত, হালাল, হারাম, বিবাহ-তালাক, সমাজনীতি, রাজনীতি, অর্থনীতি, ইতিহাস, বিজ্ঞান, সামরিক নীতি, পররাষ্ট্রনীতি ইত্যাদি হাজারও বিষয়। যার অর্জিত জ্ঞান দ্বারা আমরা ইহকালীন কল্যাণের পথ এবং পরকালীন মুক্তির পথ পেতে পারি। আল-কুরআনে সাহিত্যের সে অনুপম ঝরনাধারা প্রবাহিত। যুগ ধরে সকল সাহিত্যমোদিরা কোরআন হতে সাহিত্য সুধা গ্রহণ করে তাদের সাহিত্য ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ করেছে। আল-কুরআনের সাহিত্য মান প্রসঙ্গে মহাকবি গ্যেটে বলেন, "যত বেশি বিরক্তি নিয়েই আমরা এ গ্রন্থের প্রতি দৃষ্টপাত করি না কেন, দৃষ্টিপাতের সঙ্গে সঙ্গে এ গ্রন্থ সকল বিরক্তির অবসান ঘটায়। শ্রতাদের শান্ত ও সন্তুষ্ট করে, আকর্ষণ করে এবং সর্বশেষে এর প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শনে পাঠককে বাধ্য করে। উদ্দেশ্যের সাথে সঙ্গতিপূর্ণ এর ধরণ, এর ভাষা এতো বেশি জোরালো, প্রত্যয়দীপ্ত ও পূর্ণাঙ্গ যে কোনো যুগে ও কালের যে কোনো পরিবেশ পরিস্থিতিতে এ গ্রন্থ সঠিক অর্থেই শাশ্বত ও জীবন্ত গ্রন্থ হিসেবে সর্বাধিক প্রভাব ছড়াতে সক্ষম।"

তাই এই সাহিত্যগ্রন্থের অমিয়সুধায় অমিয় যাদু লুকিয়ে আছে। এ বিদ্যুৎ যাকে একবার স্পর্শ করে তা তাকে সত্যের মঞ্জিল পর্যন্ত পৌঁছায়। হযরত উমর (রা) ইসলাম গ্রহণের পূর্বে তার বোন ও ভগ্নীপতি সাঈদকে কুরআন থেকে বিচ্ছিন্ন করতে গিয়ে নিজেই কুরআনের প্রেমিক হয়েছিলেন। এর সাহিত্যছন্দ এতো বেশি যাদুকরি যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর কুরআনের ঘোর বিরোধী শত্রুরাও গোপনে রাসূলের তিলাওয়াত শুনতে আসত। সাহাবীদের মনোমুগ্ধকর তিলাওয়াতে আকাশ থেকে ফেরেশতাকুলসহ জ্বিন জাতিরা ছুটে আসতো। "হে নবী! বলুন, আমার প্রতি অহী নাজিল করা হয়েছে যে, জ্বীনদের একটি দল মনোযোগ সহকারে শুনছে। অতঃপর (নিজেদের) এলাকায় গিয়ে নিজ জাতির লোকদের নিকট বলেছে, আমরা এক অতীব আশ্চর্যজনক কোরআন শুনেছি। (সূরা জ্বিন, আয়াত- ১)

সার্বজনীন সাহিত্য সৌন্দর্য

পৃথিবীর এমন কোনো ভাষা নেই যা সর্বকালের এবং সর্ব যুগের মানুষের জীবনাদর্শ তুলে ধরতে সক্ষম। কোরআন সকল ভাষা-ভাষীর, বর্ণ ভেদাভেদ মুক্ত ও সকল সমস্যার সমাধানযোগ্য। এর প্রতিটি বিধান সার্বজনীনতা ও মানবতাবোধে উজ্জীবিত। সকল প্রকার মানুষের অধিকার সম্বলিত পবিত্র আল-কুরআন। যেমন হত্যা সম্পর্কে কোরআনের বক্তব্য খুবই সার্বজনীনতা পূর্ণ। আল-কুরআনের ঘোষণা ঃ

"মান ক্বাতালা নাফছান বিগাইরি নাফছিন আউফাশাদি ফিল আরদি ফাকাআন্নামা ক্বাতালান্নাসা জামিয়া। ওয়া মান আহ ইয়াহা ফাকা আন্নামা আহইয়ান্নাসা জামিয়া।"

অর্থ : যে কোনো মানুষকে হত্যা করল ও জমিনে ফাসাদ সৃষ্টি করল, সে যেন সমগ্র মানবজাতিকে হত্যা করল, যে কোনো মানুষকে বাঁচালো সে যেন সমগ্র মানুষের জীবন বাঁচালো।" (সূরা মায়িদাহ, আয়াত- ৩)

নানামুখী ষড়যন্ত্র

ইসলামী আন্দোলনগুলোর নেতৃবৃন্দ সামান্য একটু চিন্তা করলে এক মহাসত্যে পৌঁছে যাবে যে, সাহিত্য সৌন্দর্য এ কুরআনের দাবী আজ নানামুখী ষড়যন্ত্রের কারণে যথাস্থানে পৌঁছানো অসম্ভব হচ্ছে। কেউ মনে করছেন নামাজের মাধ্যমে রাষ্ট্রের সকল মানুষ ভালো হয়ে যাবে। আবার কেউ মনে করে কিতালের মাধ্যমে এ দেশের ওয়ার্ড থেকে শুরু করে পার্লামেন্ট পর্যন্ত কুরআনের আলো পৌঁছে যাবে। ইসলামি আন্দোলনসমূহের এ মজবুত ভিত্তির সুযোগে ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদীরা আল-কোরআনকে নিয়ে নানামুখী নতুন নতুন ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। এক শ্রেণীর মুসলমান পাশ কাটিয়ে দূরে গিয়ে বসেন।-তারা যারা কোরআন বুঝে তাদের এবং বিরোধীদের মধ্যে নানা সমস্যা দেখে নিজেকে গুটিয়ে রাখেন্‌ততে বিরোধী ধর্ম নিরপেক্ষবাদীদের আরো বজ্র কঠোর হতে সাহায্য করেন। তাদের নীরবতার সুযোগকে তারা যথাযোগ্যভাবে ব্যবহার করেন। যার ফলে আমাদের মা-বোনদেরকে ঘর থেকে পর্দাহীনভাবে বের করার ষড়যন্ত্র তারা অব্যাহত রেখেছে।

ধর্মীয় শিক্ষাব্যবস্থাকে বিশেষ করে মাদরাসা শিক্ষাকে বন্ধ করার উন্মাতাল নেশায় মেতে উঠেছে। তারা আজকে সন্ত্রাসবাদের নাম করে কোরআন পাগল নারী-শিশু, অন্ধ দেশপ্রেমিকদের নির্বিচারে হত্যা করে যাচ্ছেন। তাদের এক মহান। পৃষ্ঠপোষক সাবেক ব্রিটিশ পার্লামেন্ট সেক্রেটারি অব কলোনি জর্জ গ্লাড স্টোন এক ভাষণে বলেছেন, "So long as the Muslims have the Quran, We shall be unable to dominate them, or make them lose their love of it." অর্থাৎ "যতদিন মুসলমানদের কাছে আল-কুরআন থাকবে আমরা তাদেরকে বাধ্য করতে পারবো না, হয় আমাদেরকে তাদের কাছ থেকে এটি ছিনিয়ে নিতে হবে অথবা তারা যেন এর প্রতি ভালবাসা হারিয়ে ফেলে তার ব্যবস্থা করতে হবে।"

এমনিভাবে মহান আল্লাহ যুগে যুগে ফেরাউন, নমরুদ, উতবা, শায়বাদের এক শ্রেণীর মানুষকে তার দ্বীন থেকে দূরে সরিয়ে নিজের জাহান্নাম রচনার সুযোগ দিয়েছিলেন। অপরপক্ষে যারা এ গ্রন্থকে বুকে ধারণা করে জীবন কাটিয়েছেন তাদের অনেকেই দুনিয়ায় জান্নাতের সুসংবাদ পেয়েছিলেন।

ইতিহাস থেকে শিক্ষা গ্রহণ না করে ষড়যন্ত্রকারীর তাদের মনের ইচ্ছা ও আবেগের ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করছেন। তারা তাদের মুখের ফুঁৎকারে আল্লাহর নূর নিভিয়ে দিতে চায়। অথচ আল্লাহ তাঁর নূরকে প্রজ্জ্বলিত করবেন। অপর এক ঘোষণা আল্লাহ তাআলা বলেন "নিশ্চয় আমি নিজে আল কুরআন অবতীর্ণ করেছি। আর আমি নিজেই এর হেফাযতকারী।" (আল-হিজর, আয়াত ৯)

সাহিত্য সৌন্দর্য আর-কুরআনের দাবী

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কেন এরূপ একটি নির্ভুল গ্রন্থ আমাদেরকে উপহার দিয়েছেন। এ পবিত্র মহাগ্রন্থ আল-কুরআন খুতবা, তিলাওয়াত বা মুখস্ত করে মাথা বন্দী করে রাখা এর দাবী নয়। এর দাবী ও কাজ হচ্ছে–

"ইহা মানুষের জন্য হেদায়াত আর সত্য ও মিথ্যার পার্থক্যকারী।"

আল্লাহ মানুষকে অতি উত্তম আকৃতিতে সৃষ্টি করেছেন এবং দান করেছেন ইসলামের মত এক শাশ্বত জীবন বিধান। তিনি দাবী জানিয়েছেন, "আলাল্লাহুল খালকু ওয়াল আমরু" অর্থ: "সাবধান! সৃষ্টি যার হুকুমের অধিকার তার।" বিশ্বের আজ কোটি কোটি মানুষের আর্তনাদ, চিৎকার, হাহাকারের এক আওয়াজ দিকে দিকে ধ্বনিত হচ্ছে। তারা আজ মানব রচিত যন্ত্রের যাঁতাকাল থেকে মুক্তি পেতে চায়। কিন্তু একটি ভয়ে এসে বার বার হাতছানি দিচ্ছে যে, তারা সীসা ঢালা প্রাচীর রূপে দৃঢ় অবস্থানে টিকে থাকতে পারছেন না। আজ তাদেরকে ফিরে যেতে হবে মহানবী হযরত মোহাম্মদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এর নব নির্মিত সমাজের দিকে। যার সংবিধান ছিল সাহিত্যময় আল-কোরআন।

আল্লাহ প্রকৃত কথা হচ্ছে তিনি তো নিরাকার আবার সর্বত্র বিরাজমান। তবে তার দাবীর মাধ্যম হচ্ছে আল-কোরআন। এর বাইরে যদি আমরা চলি তবে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য। তাই কোরআন দু ভাবে আমাদের কাছে দাবী জানায়। যথা :

ক) Indivisual responsibility বা ব্যক্তিগত দায়িত্বশীলতা। অর্থাৎ এ গ্রন্থ আমাদেরকে পড়তে হবে, জানতে হবে বুঝতে হবে এবং এর দাবীনুসারে আমাদেরকে মনে চলতে হবে।

খ) Collective responsibility বা যৌথ দায়িত্বশীলতা অর্থাৎ এ গ্রন্থের দাবী নিজে মানার সাথে সাথে অন্যদেরকেও এর দিকে ডাকতে হবে। কুরআনের ভাষায়, 'কাতিলুহুম হাত্তা লা তাকুওনা ফিতনাতুও ওয়া ইয়াকুত্তানাদ্দীনু কুল্লাহুলিল্লাহ।" অর্থাৎ তোমরা লড়াই কর ততক্ষণ পর্যন্ত যতক্ষণ না ফিৎনা নির্মূল হয়ে যাবে, আর দ্বীন শুধু আল্লাহর জন্য নির্ধারিত হবে।" (আল-কুরআন)